Mary Carpenter Series.

মেরী কার্পেন্টার গ্রন্থাবলি।

PRABANDHA-KUSUM

BY

RAJANIKANTA GUPTA.

AUTHOR OF "HISTORY OF THE GREAT SEPOY WAR" &C

প্রবন্ধ কুসুম।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত বিরচিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

CALCUTTA:

PRINTED BY BEHARY LALL BANNERJEE
AT MESSRS J G CHATTERJEA & CO'S PRESS,
44, AMHERST STREET
PUBLISHED BY THE MEDICAL LIBRARY
97 COLLEGE STREET
1881

বিজ্ঞাপন।

যে উদ্দেশ্যে "প্রবন্ধ-কুসুম" মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল, স্থানান্তরের বিজ্ঞাপনে তাহা পরিস্ফুট হইবে।

পুস্তক খানি অপেক্ষাকৃত উচ্চ অঙ্গের ও ওজোগুণ-সম্পন্ন করিতে সভার ইচ্ছা ছিল। তদনুসারে ইহার ভাষা নিতান্ত সরল করা হয় নাই। ভাষা অপেক্ষাকৃত উচ্চ অঙ্গের হইলেও বোধ হয়, ইহাতে মাধুর্য্য বা লালিত্যের অভাব লক্ষিত হইবে না। সকল স্থানের ভাষাই কোমল, মধুর, ললিত ও গ্রাম্যতা-হীন করিতে যথাশক্তি প্রয়াস বিহিত হইয়াছে।

সভার মতানুসারে "প্রবন্ধ-কুসুমে" ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই বিষয় গুলি কেবল মহিলাদিগের নয়, তরুণমতি ছাত্রদিগেরও সম্যক্ পাঠোপযোগী হইয়াছে। এজন্য আশা করি, "প্রবন্ধ-কুসুম" শিক্ষার্থিনী যুবতীদিগের ন্যায় যুবকদিগেরও একখানি পাঠ্য গ্রন্থ হইবে।

"প্রবন্ধ-কুসুমের" ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয় বিবিধ পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। তজ্জন্য সেই সমস্ত গ্রন্থকারদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ রহিলাম। ইতি।

হিন্দুহোষ্টেল,
কলিকাতা।
২১এ পৌষ ১২৮৬।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

জাতীয় ভারতসভার স্থাপয়িত্রী কুমারী মেরী কার্পেণ্টার লোকান্তরিত হইলে তাঁহার স্মৃতি চিহ্ন রাখিবার জন্য তদীয় সম্মানিত নামে বঙ্গীয় মহিলাদিগের পাঠোপযোগী গ্রন্থাবলি প্রচারের প্রস্তাব হয়।

প্রথমে এই গ্রন্থাবলির অন্তর্গত যে দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করা হয়, উপস্থিত পুস্তক খানি সেই গ্রন্থদ্বয়ের অন্যতর। বঙ্গ-কুল-যুবতীদিগের জন্য এই পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। আশা করি, ইহা তাঁহাদিগের একখানি প্রধান পাঠ্য গ্রন্থ হইবে।
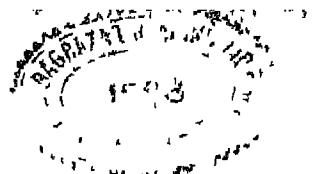
শ্রীমনোমোহন ঘোষ।
এম্, এস্, নাইট।
জাতীয় ভারত সভার বঙ্গশাখার অবৈতনিক সম্পাদক।

সূচী।

প্রবন্ধ কুসুম।

ললনা-চতুষ্টয়।

স্ত্রীজাতি সমাজের লক্ষ্মী স্বরূপ। লজ্জা, বিনয়, নম্রতা ও শীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিত হইলে নারীগণ দুঃখ দারিদ্র্য-পূর্ণ ও রোগ-শোক-তাপময় সংসার-ক্ষেত্রে সর্ব্বদা শান্তির অমৃত-ধারা বর্ষণ করিয়া থাকেন। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা এই জন্যই স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, শ্রীতে ও স্ত্রীতে কোনও বিশেষ নাই। ফলে ললনাগণ মূর্ত্তিমতী দেবতা হইয়া ভূলোককে স্বর্গের তুল্য আনন্দময় করিয়া তুলেন। সুকোমল প্রাভাতিক লক্ষ্মী ও সায়ন্তন-শ্রী উভয়বিধ শোভাই নারীর কমনীয় হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। যে গুণের প্রভাবে মানবগণ বিজ্ঞান ও গণিতের জটিল অর্থ প্রকাশ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিতে-ছেন, যথানিয়মে রাজশক্তি প্রয়োগ করিয়া সুরাজতার পরিচয় দিতেছেন এবং রণ-পাণ্ডিত্য ও নীতি-কৌশল প্রদর্শন করিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত হইতেছেন, নারীজাতিতেও সে গুণ বিরল নহে। লীলাবতী, খনা প্রভৃতিতে আমরা বুদ্ধি-গৌরবের পরা-কাষ্ঠা দেখিতে পাই, সংযুক্তা, অহল্যাবাই প্রভৃতিতে সুশাসন-নৈপুণ্য ও সুরাজশক্তি দর্শন করিয়া পুলকিত হই এবং তারাবাই, দুর্গাবতী প্রভৃতিতে সামরিক কৌশল ও নীতি-জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদের যশোগানে প্রবৃত্ত হই। এস্থলে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে যে কয়েকটী ভারতীয় ললনার বিবরণ লিখিত

হইতেছে, তাঁহারাও নারীজাতির আদর্শভূতা এবং স্বর্গস্থ দেবী সমাজের বরণীয়া। ইহাঁদেরও বিবরণ পাঠে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, নারীজাতি বিদ্যা, অভিজ্ঞতা ও হিতৈষিতা প্রভৃতিতে পুরুষ জাতি অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।

আবিয়ার।

আবিয়ার দক্ষিণাপথ-বাসিনী। ইনি কবি কামবনের * সম-কালবর্ত্তিনী ছিলেন। কামবনের ন্যায় আবিয়ারও পাণ্ডিত্যগুণে প্রসিদ্ধ হন। জ্যোতিষ, চিকিৎসা-শাস্ত্র, ভূবিদ্যা প্রভৃতি অনেক বিষয়ে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। তিনি এই সকল বিষয়ে কতিপয় অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। আবিয়ার চিরকুমারী ছিলেন, তাঁহার স্বভাব অতি পবিত্র ছিল। শাস্ত্র জ্ঞানের সহিত চারিত্র-গুণ তাঁহাকে এরূপ অলঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছিল যে, সকলেই তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা বলিয়া, আদর, সম্মান ও ভক্তির সহিত তাঁহার গুণ-গৌরব ঘোষণা করিত। আবিয়ারের প্রণীত ধর্ম্মনীতি বিষয়ক প্রস্তাব সকল তামিল বিদ্যালয়-সমূহে পঠিত হইয়া থাকে।

আবিয়ারের উপজা, বালী ও উরুব্যা নামে তিনটী ভগিনী ছিলেন। ইহাঁরাও কখনও বিদ্যোপার্জ্জনে অবহেলা করেন নাই। উপজা এক খানি ধর্ম্মনীতি বিষয়ক গ্রন্থ প্রচার করেন, ইহা তামিল ভাষায় এক খানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ। বালী ও উরুব্যা কবিত্ব-শক্তিতে সাতিশয় প্রসিদ্ধা ছিলেন।

মৃগনয়না।

মৃগনয়না গুর্জ্জর-রাজের কন্যা। ইনি গোয়ালিয়রের অধি-পতি মহারাজ মানসিংহের মহিষী ছিলেন। অসাধারণ রূপ-

* কামবন তামিল ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন। তামিল ভাষাভিজ্ঞ লোকে এই গ্রন্থ আদর সহকারে পাঠ করিয়া থাকেন।

লাবণ্য মৃগনয়নার সুকোমল দেহ সাতিশয় কমনীয় ও মনো-হর করিয়া তুলিয়াছিল। মৃগনয়না কেবল অসামান্য রূপ-লাবণ্যবতী বলিয়া প্রসিদ্ধা ছিলেন না, অন্যান্য গুণগ্রামেও তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে প্রসারিত হইয়াছিল। সঙ্গীত শাস্ত্রে মৃগনয়না সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে গোয়ালিয়র রাজ্যে সঙ্গীত শাস্ত্রের আত্যন্তিক আদর ছিল; এবং প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ক্রমে উহার অনুশীলন হইত। সঙ্গীত শাস্ত্রের অনেক গুলি রাগিণী মৃগনয়নার নামে প্রসিদ্ধ আছে। সংগীত শাস্ত্রে মৃগনয়না এরূপ পারদর্শিনী ছিলেন যে, প্রসিদ্ধ সঙ্গীতা-চার্য্য তানসেন তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণ মানসে গোয়ালিয়রে আসিতে সঙ্কুচিত হন নাই।

হঠী বিদ্যালঙ্কার।

হঠী বিদ্যালঙ্কার রাঢ়ী-শ্রেণীয় ব্রাহ্মণকন্যা। ন্যায় ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে ইনি সাতিশয় ব্যুৎপন্না ছিলেন। হঠী বারাণসীতে যাইয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। বাঙ্গালা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও দক্ষিণাপথবাসী অনেক ছাত্র এই চতুষ্পাঠীতে আসিয়া তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিত। হঠী সবিশেষ নৈপুণ্যের সহিত ও পরি-শুদ্ধ প্রণালীতে এই সকল ছাত্রদিগকে দর্শন, ন্যায়, স্মৃতি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। অসামান্য শাস্ত্রাভিজ্ঞতা-বলে তাঁহার সম্মান এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত এবং ক্রিয়া-কাণ্ড উপলক্ষে সকল স্থান হইতেই তাঁহার নিকট নিমন্ত্রণ-পত্র উপস্থিত হইত। হঠী বিদ্যা-লঙ্কার আহ্লাদ সহকারে এই সকল নিমন্ত্রণ পত্র গ্রহণ করিতেন, এবং আহ্লাদ সহকারে সভায় উপস্থিত হইয়া সমাগত পণ্ডিত মণ্ডলীর সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ ও শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন।

পন্না।

পন্না চিতোরের অধিপতি ও উদয়পুর নগরের স্থাপন-কর্ত্তা উদয় সিংহের ধাত্রী। উদয় সিংহ অপ্রাপ্তবয়স্ক ও রাজ্য রক্ষায় অসমর্থ ছিলেন। সুতরাং মন্ত্রিগণ তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত তদীয় পিতার দাসী-পুত্র বনবীরের হস্তে মিবারের শাসন-দণ্ড সমর্পণ করেন। কিন্তু বনবীর আজীবন রাজ্য ভোগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, এবং আপনার রাজত্ব নিরাপদ করিবার জন্য উদয় সিংহকে বধ করিতে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠেন। এই সময়ে উদয় সিংহের বয়স ছয় বৎসর মাত্র। একদা রাত্রিকালে এই ষড়্‌বর্ষীয় বালক আহার করিয়া নিদ্রিত আছে, এমন সময়ে এক জন ক্ষৌরকার তাহার ধাত্রী পন্নাকে এই ভয়ানক সংবাদ জানায়। ধাত্রী তৎক্ষণাৎ একটী ফলের চাঙ্গাড়ির মধ্যে নিদ্রিত উদয় সিংহকে রাখিয়া তাহার উপরিভাগ পত্রাদিতে আচ্ছাদন পূর্ব্বক ক্ষৌরকারের হস্তে সমর্পণ করে। বিশ্বস্ত ক্ষৌরকার সেই চাঙ্গাড়ি লইয়া কোন নিরাপদ স্থানে যায়। এদিকে অস্ত্রপাণি ঘাতক আসিয়া ধাত্রীকে উদয় সিংহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু ধাত্রী বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না, কেবল অবনত নয়নে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্বীয় নিদ্রিত শিশু পুত্রের প্রতি অঙ্গুলি প্রসারণ করিল। ঘাতক উদয় সিংহ বোধে সেই ধাত্রী পুত্রেরই প্রাণ সংহার পূর্ব্বক যথাস্থানে চলিয়া গেল। ধাত্রী নীরবে এই শোচনীয় কাণ্ড দর্শন করিল, নীরবে প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে মৃত্যু মুখে পাতিত করিয়া হিন্দুকুল-সূর্য্য বাপ্পারাওর বংশ রক্ষা পূর্ব্বক অসামান্য হিতৈষিতা ও অশ্রুতপূর্ব্ব প্রভুভক্তির পরিচয় দিল, এবং নীরবে ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে পুত্রের প্রেতকৃত্য সম্পন্ন করিয়া বিশ্বাসী ক্ষৌরকারের সহিত সম্মিলিত হইল।

রাণা সঙ্গের সন্তানের জন্য রাজপুত ধাত্রী পন্নার এই ত্যাগ স্বীকার জগতের ইতিহাসে দুর্লভ। যে চিতোরের জন্য, হিন্দুকুলের ললাট-মণি মিবারাধিপতির বংশ রক্ষার নিমিত্ত অবলীলায় অম্লানভাবে বাৎসল্যের একমাত্র আধার, স্নেহের অদ্বিতীয় অবলম্বন, প্রীতির পরম পাত্র—শিশু সন্তানকে মৃত্যু-মুখে সমর্পণ করে, তাহার স্বার্থ ত্যাগ কতদূর মহান্, কতদূর উচ্চভাবের পরিচায়ক। যে স্বদেশের গৌরব রক্ষার্থ হৃদয়-রঞ্জন কুসুম কলিকাকে বৃন্তচ্যুত দেখিয়াও কর্ত্তব্য-বিমুখ না হয়, তাহার হৃদয় কতদূর তেজস্বিতা ও কতদূর স্বদেশহিতৈষিতার পরিপোষক! প্রকৃত তেজস্বী ও প্রকৃত দেশহিতৈষী ব্যতীত অন্য কেহ এই তেজস্বিনী নারীর হৃদয়গত মহান্ ভাব বুঝিতে সমর্থ হইবেন না। ভীরু প্রকৃতি, ধাত্রীকে রাক্ষসী বলিয়া ঘৃণা করিতে পারে, কিন্তু তেজস্বিনী প্রকৃতি তাহাকে মূর্ত্তিমতী হিতৈষিতা বলিয়া চিরকাল যত্নের সহিত হৃদয়ে রক্ষা করিবে। ফলে ধাত্রীর নিঃস্বার্থ হিতৈষণা তাহার রাক্ষসী ভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে যাবৎ হিতৈষিতা ও তেজস্বিতার সমাদর থাকিবে, পবিত্র ইতিহাস তাবৎ এই স্বার্থ ত্যাগ ও তেজস্বিনী পন্নার কখনও অসম্মান করিবে না।

উদ্ভিদ্-তত্ত্ব।

উদ্ভিদ্ জাতিতে বিশ্বপতির অত্যাশ্চর্য্য কৌশল ও অসীম মহিমার চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্‌বেত্তা পণ্ডিত-গণের সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে উদ্ভিদের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। স্থিরচিত্তে এই সকল তত্ত্বের আলোচনা করিলে হৃদয়ে অনুপম প্রীতির সঞ্চার হয়।

জীব-সমূহের যেরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, উদ্ভিদ্ দেহেও সেই-রূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কার্য্যনির্ব্বাহক পদার্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে। উদ্ভিদের দেহ কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম তন্তুতে নির্ম্মিত হয়। এই সকল তন্তু কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম কোষের সমষ্টি মাত্র। এজন্য পণ্ডিতগণ ইহাকে কৌষিক তন্তু নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এইরূপ লক্ষ লক্ষ কৌষিক তন্তু একত্রিত হইয়া উদ্ভিজ্জের মজ্জা, পত্র, পুষ্প প্রভৃতি সংগঠিত করে। উদ্ভিদের বীজ উপযুক্ত ভূমিতে উপ্ত হইলে এবং উপযুক্ত তাপ ও জল পাইলে তাহার অভ্যন্তরস্থ কৌষিক ত্বক্ ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া বীজটীকে দুই ভাগে বিদীর্ণ করে। পরে ঐ বীজ হইতে দুটী ইন্দ্রিয় বহির্গত হয়। এই ইন্দ্রিয়দ্বয়ের প্রথমটী বৃক্ষের মূল এবং দ্বিতীয়টী বৃক্ষের স্কন্ধ, শাখা প্রভৃতি রূপে পরিণত হইয়া থাকে। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, অগ্রে প্রথম ইন্দ্রিয়টী বহির্গত হয়, উহা পার্থিব রস আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলে দ্বিতীয় ইন্দ্রিয়টী স্কন্ধ, শাখা প্রভৃতি রূপে পরিণত হইয়া উঠে।

অনেকের বিশ্বাস, উদ্ভিজ্জের চেতনা নাই। কিন্তু পণ্ডিত-গণের সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে এ বিশ্বাসের অলীকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। জন্তুগণ যেমন আপনাদের অবস্থার উপযোগী খাদ্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া প্রাণ ধারণ করে, উদ্ভিজ্জও

তেমনই আপনার অবস্থানুরূপ দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকে। বিশ্বকর্ত্তার অত্যাশ্চর্য্য কৌশল প্রভাবে বৃক্ষ সকল বুদ্ধিমান্ পুরুষের ন্যায় আপনার ইষ্টানিষ্ট বুঝিয়া অসার ভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সার ভাগ গ্রহণ করিয়া জীবিত রহে। রস ও আলোক উদ্ভিজ্জের জীবন রক্ষার প্রধান বিষয়। সুতরাং উদ্ভিজ্জ এই দুই বিষয় উপযুক্তরূপে লাভ করিয়া জীবিত থাকিবার জন্য সবিশেষ যত্ন পাইয়া থাকে। কোন বৃক্ষের মূলদেশের এক পার্শ্বে সারহীন ও অপর পার্শ্বে উত্তম মৃত্তিকা থাকিলে সেই বৃক্ষের শিকড় সকল সারহীন পার্শ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সসার মৃত্তিকার অভিমুখে গমন করে। কোন বৃক্ষের শাখা অধোমুখ করিয়া রাখিলে তাহার অগ্রভাগ পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধমুখ হয়। লতার আকর্ষ সকল ছায়ার দিকে যাইয়া থাকে। ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, যে সকল লতা প্রাতঃকালে রৌদ্র পায়, তাহার আকর্ষ আঁকাড়) পশ্চিমাভিমুখ এবং যে গুলি বৈকালে রৌদ্র পায় তাহার আকর্ষ পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া থাকে। গৃহমধ্যে ক্ষুদ্র বৃক্ষ রাখিলে উহার অগ্রভাগ রৌদ্র পাইবার জন্য গবাক্ষের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হয়।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রকারেও উদ্ভিজ্জ-বিশেষের গতিশক্তি ও চেতনা পরিব্যক্ত হইয়া থাকে। লজ্জাবতী লতা ইহার একটী প্রধান দৃষ্টান্ত-স্থল। স্পর্শ করিবামাত্র এই লতার পত্র সকল সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। বন-চণ্ডালিকা (বন-চাঁড়াল) নামে এক প্রকার বৃক্ষ আছে। দিবাভাগে মেঘ না থাকিলে এই বৃক্ষের পত্র সকল আপনা হইতেই ঘূর্ণ্যমাণ ও সঞ্চালিত হইয়া থাকে। মনুষ্য যেমন অধিক পরিমাণে অহিফেণ সেবন করিলে সংজ্ঞাশূন্য ও স্থল বিশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, লজ্জাবতী লতাও সেইরূপ অহিফেণ সংস্পর্শে অচেতন ও বিশুষ্ক হইয়া

পড়ে। এই লতার মূলে অহিফেন-মিশ্রিত জল দিলে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে উহা চেতনাশূন্য হয়; বহুক্ষণ পর্য্যন্ত রৌদ্রাদির উত্তাপ পাইলেও উহার পত্র বিকশিত হয় না। অহিফেণের জল দুই দিবস ক্রমাগত সেচন করিলে এই লতা মরিযা যায়। ক্লোরো-ফরম্ নামে এক প্রকার ঔষধ আছে, উহার ঘ্রাণে মনুষ্য চেতনা শূন্য হয়; লজ্জাবতী লতাতেও এই ক্লোরোফরমের কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই লতার এক পার্শ্বে ঐ ঔষধের বাষ্প লাগাইলে তাহা তৎক্ষণাৎ সুপ্ত হয়, অপর পার্শ্বে সতেজ ও জাগ্রৎ থাকে।

জীবগণ যেমন আপন আপন দেহ রক্ষার জন্য যত্নবান্ হয় উদ্ভিজ্জগণও সেইরূপ আপনাদিগকে রক্ষা করিতে নিযত যত্ন পাইয়া থাকে। বৃক্ষ সকল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আলোক লাভের নিমিত্ত কিরূপ ব্যগ্র হয়, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যদি কখন কোন ক্ষুদ্র তরু অন্ধকারাবৃত কোন ঝোপের অভ্যন্তরে জন্মে, তাহা হইলে তাহা আলোক লাভের নিমিত্ত আপনার স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যকেও অতিক্রম করিযা থাকে। আলোক পাইলে বৃক্ষের পত্র সকল হরিদ্বর্ণ হয; আলোকের অভাবে উহা একান্ত শীর্ণ হইয়া পড়ে। সচরাচর দেখা যায়, কালিকাসুন্দা প্রভৃতির পত্র সমূহ দিবালোকে বিকশিত ও সাযংকালে মুদ্রিত হয। যদি কখন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে মেঘে দিঙ্মণ্ডল ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, তাহা হইলেও এই সকল বৃক্ষপত্র মুদ্রিত দেখা যায়। এতদ্দ্বারা উদ্ভিজ্জের অঙ্গসঞ্চালন-শক্তি পরিস্ফুট হইতেছে।

উত্তর কারোলাইনা দেশের মক্ষিকাজাল অথবা মক্ষিকা-পাশ নামে বৃক্ষ বিশেষে এই অঙ্গসঞ্চালন শক্তির কার্য্যকারিতা প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। এই বৃক্ষের পত্র-সমূহের উভয় পার্শ্বে এক এক শ্রেণী কণ্টক বর্ত্তমান আছে। পত্রের ঊর্দ্ধ

পৃষ্ঠে এক প্রকার মিষ্ট রস জন্মে। মক্ষিকাগণ এই রস লোভে পত্রের উপর বসিলেই পত্রটী মুদ্রিত হয়। যাবৎ নিবদ্ধ কীট বিনষ্ট না হয়, তাবৎ উহা পুনঃ প্রস্ফুটিত হয় না।

এক প্রকার সামুদ্রিক শৈবাল আছে উহার সমস্ত দেহ আপনা হইতেই ঘূর্ণিত হইয়া থাকে। অপর কতকগুলি শৈবাল স্বেচ্ছাবিহারী। এ গুলি কোন জলপূর্ণ পাত্রে রাখিলে পাত্রের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে গমন করে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই গতি সূক্ষ্মরূপে দৃষ্ট হয়। অনেক পুষ্পও এইরূপ গতি-শক্তি-বিশিষ্ট। ঝুম্‌কা পুষ্প ও ফণিমনসা জাতীয় পুষ্পের গর্ভকেশর ঘূর্ণিত হইয়া থাকে। আমেরিকা দেশে এক প্রকার অগাছা জন্মে, তাহার পত্র স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা মুদ্রিত হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত এরূপ অনেক বৃক্ষ আছে যে, তাহার পত্র রাত্রিকালে মুদ্রিত হয় এবং দিবসে বিকশিত হইয়া থাকে। অনেক পুষ্পও এইরূপ মুদ্রিত ও বিকশিত হয়। লোকে এই মুদ্রণকে বৃক্ষের নিদ্রা এবং বিকাশকে বৃক্ষের চেতনা বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

উদ্ভিজ্জের যেরূপ চেতনা ও অঙ্গ সঞ্চালন ক্ষমতা আছে, সেই রূপ উহাদের অঙ্গে এক অসাধারণ শক্তিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। উদ্ভিদের এই শক্তির বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখিলে অবাক্ ও হতবুদ্ধি হইতে হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, উদ্ভিদের বীজ হইতে যে দুটী ইন্দ্রিয় বহির্গত হয়, তাহার একটী মৃত্তিকার অভ্যন্তরে যাইয়া মূলরূপে পরিণত হয়। এই মূল দ্বারা পার্থিব রস আকর্ষণ করিয়া উদ্ভিদ্ ক্রমশঃ পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। কোন রূপ বাধা উপস্থিত হইলেও উদ্ভিদ্ আপনার পরিপুষ্টি ও পরিবর্দ্ধন জন্য যথাশক্তি যত্ন করিয়া থাকে। এজন্য তাহারা অভাবনীয় শক্তি বিকাশ করিতেও কাতর হয় না।

সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতি কোমল নবাঙ্কুর অতি কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধাভিমুখ হয়। সদ্যঃপ্রসূত বংশাঙ্কুর এরূপ কোমল হয় যে, ক্ষীণশক্তি বালকও অনায়াসে তাহা ভাঙ্গিতে পারে। কিন্তু এই সুকোমল অঙ্কুরের শিরোদেশে একটী হাঁড়ি বিপর্য্যস্ত করিয়া রাখ, দেখিতে পাইবে, সেই বংশাঙ্কুর হাঁড়িটী মস্তকে ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে। যদি হাঁড়ি মৃত্তিকায় দৃঢ় রূপে আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলেও কোমলপ্রাণ বংশাঙ্কুর তাহা ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধাভিমুখ হয়। হাঁড়ির প্রতিকূলতায় অঙ্কুরের পরিবর্দ্ধন কোনও ক্রমে ব্যাহত হয় না।

সকলেই গিলে ও নাটাফল, তাল ও আম্রের বীচ দেখিয়াছেন। এই বীচ যে কত দৃঢ় এবং কত কষ্টে যে উহা ভেদ করা যায়, তাহাও সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু সুকোমল নবাঙ্কুর এই কঠিন আবরণও অবলীলায় ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধাভিমুখ হয়। এই রূপে অঙ্কুরোদ্গম সময়ে বীজস্থ কোমল কৌষিক ত্বক্ অসাধারণ শক্তির কার্য্য করিয়া থাকে।

রাত্রিকালে কোন কোন উদ্ভিজ্জ হইতে আলোক নির্গত হইয়া থাকে। অনেকেই উদ্ভিজ্জ বিশেষের এই আশ্চর্য্য ধর্ম্মের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ড্রমণ্ড নামে একজন ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন যে, অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে স্বান নদীর তীরে এক প্রকার ছত্রক (বেঙের ছাতা) তাঁহার দৃষ্টি-গোচর হইয়াছিল। রজনীতে এই ছত্রক এরূপ উজ্জ্বল আলোক-মালায় শোভিত হইত যে, তিনি সেই আলোকের সাহায্যে অনায়াসে পুস্তক পাঠ করিতেন। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল দেশে এক প্রকার ছত্রক আছে, রাত্রিকালে তাহা হইতে খদ্যোতের আলোকের ন্যায় ঈষৎ হরিদ্বর্ণের জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া থাকে। ড্রেস্‌ডেন

নগরের কয়লার খনিতে ভিলাইন সাহেব ছত্রক-বিশেষ হইতে এইরূপ রশ্মি নির্গত হইতে দেখিয়াছেন। কয়েক প্রকার গেঁদা পুষ্পও সন্ধ্যার সময় উজ্জ্বল বোধ হইয়া থাকে। আমাদের দেশে এক প্রকার একপত্রিক বৃক্ষ আছে, তাহার মৃত্তিকার নিম্নস্থ কাণ্ড জলে সিক্ত করিলেই আলোক-পূর্ণ হইয়া উঠে। যতক্ষণ জল বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ এই আলোকের নির্ব্বাণ হয় না। জল শুষ্ক হইলেই উহা পূর্ব্ববৎ রশ্মি-বিহীন হইয়া পড়ে। কি কারণে এই অদ্ভুত ব্যাপার সংসাধিত হয়, তাহার নিরূপণার্থ বৈজ্ঞানিকের গবেষণা নানা প্রকার যত্ন প্রদর্শন করিতেছে।

দেশভেদে উদ্ভিদ্ জাতির বিভিন্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম মণ্ডলে যে সকল উদ্ভিজ্জ জন্মে, তাহা হিম-মণ্ডলে উৎপন্ন হয় না, এবং হিমমণ্ডলের উদ্ভিজ্জও সমমণ্ডলের শোভা বিকাশ করে না। গ্রীষ্ম মণ্ডল উদ্ভিজ্জ সমূহের প্রধান উৎপত্তি-ক্ষেত্র। এই মণ্ডলে ধান্য, ইক্ষু, আম্র, খর্জ্জুর, দারুচিনি, প্রভৃতি বিবিধ উপাদেয় দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এই ভূখণ্ডের কোন কোন বৃক্ষ সুমধুর ফল প্রদান করিয়া মানব-রসনার তৃপ্তি সাধন করিতেছে, কোন কোন বৃক্ষ সুশীতল ও সুপেয় বারি প্রদান পূর্ব্বক তৃষার্ত্ত ব্যক্তিকে স্নিগ্ধ ও সুখিত করিতেছে, কোন কোন বৃক্ষ নেত্র-তৃপ্তিকর কুসুম-রাজিতে সমলঙ্কৃত হইয়া বন-ভূমির শোভা দ্বিগুণিত করিয়া তুলিতেছে, এবং কোন কোন বৃক্ষ নিরন্ন ব্যক্তির জীবন রক্ষার প্রধান সম্বল হইয়া অনুপম শক্তি বিকাশ করিতেছে। এক্ষণে মানবের যত্ন ও পরিশ্রম বলে এক মণ্ডলের বৃক্ষ মণ্ডলান্তরে উৎপন্ন হইতেছে বটে, কিন্তু সেই সেই মণ্ডল পরিশ্রমোৎপন্ন বৃক্ষ সমূহের স্বাভাবিক আবাস-ভূমি নহে। দেশ ভেদে উদ্ভিজ্জ ভেদ হওয়াতে মনুষ্যের খাদ্য দ্রব্যাদিরও পার্থক্য লক্ষিত হয়। রাই নামক শস্য সুমেরু মণ্ডলবাসী মানবগণের

প্রধান খাদ্য দ্রব্য; তথায় ধান্যের উৎপত্তি হয় না। গোধূম সুমেরু মণ্ডলের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের অধিবাসিগণের জীবন রক্ষার অবলম্বন। ইহার দক্ষিণে ধান্যের উদ্ভব-ক্ষেত্র। এই ধান্যের সহিত ইক্ষু, নারিকেল, খর্জ্জুর প্রভৃতি অন্যান্য শস্যেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। ফরাসী দেশের দক্ষিণ ভাগ হইতে অয়নান্তবৃত্ত পর্য্যন্ত সীমার মধ্যে গোধূম ব্যতিরিক্ত যব, ভুট্টা, ধান্য প্রভৃতিও মনুষ্যের জীবন ধারণের প্রধান সামগ্রী।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, আলোক উদ্ভিজ্জগণের দেহরক্ষার প্রধান অবলম্বন। কিন্তু স্থল বিশেষে ইহার ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেক বৃক্ষ অন্ধকারময় খনির অভ্যন্তরে জন্মে। সমুদ্র ও নদী গর্ভে যে শৈবালের উৎপত্তি হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সমুদ্রগর্ভে যে শৈবাল উৎপন্ন হয়, তাহা দৈর্ঘ্যে পৃথিবীর অনেক সমুন্নত বৃক্ষকেও পরাজয় করিয়া থাকে। এইরূপ শৈবালে প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক স্থান পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। কিন্তু জলের অভাবে উদ্ভিজ্জ সমূহ কখনও সজীব থাকে না। আলোক যেরূপ স্থল বিশেষে উদ্ভিদ্ জাতির জীবন রক্ষার গৌণ উপাদান, জল সেরূপ নহে। জলের অভাব উপস্থিত হইলে উদ্ভিদ্ জাতি কোনও কালে কোনও অবস্থায় জীবিত থাকে না। এই জন্যই জলশূন্য মরু-প্রান্তরে বৃক্ষলতাদির অত্যন্ত অভাব দৃষ্ট হয়।

ইতর প্রাণিদিগের মনোবৃত্তি।

মানবগণ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি বৃত্তির বলে ইতর প্রাণিগণ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। এই ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি-বৃত্তির গুণে তাহারা বিজ্ঞানের গূঢ় তত্ত্ব নির্ণয় করিতেছে, হিতা-হিত বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতেছে, এবং হিতৈষিতা ও ন্যায়পরতা প্রদর্শন করিয়া ভূমণ্ডলে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে। মনুষ্য যে দয়া, ন্যায়পরতা ও বুদ্ধির প্রভাবে ঈদৃশ গুণগ্রামের অধিকারী হইয়াছে, ইতর প্রাণিদিগের মধ্যেও তাহার কিঞ্চিৎ আভাস লক্ষিত হইয়া থাকে। অনেক সময় পশ্বাদি প্রাণিগণও মনুষ্যের ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তির চালনা করিয়া সকলকে চমৎকৃত করে। যে হিতৈষিতা, কোমলতা ও উদারতা মানব জাতির প্রধান ভূষণ, পশুজাতিতেও সেই হিতৈষিতা, কোমলতা ও ন্যায়পরতা বর্ত্তমান থাকিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ জগদী-শ্বরের অনন্ত মহিমার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

বানরদিগের বুদ্ধি ও বিবেচনার সম্বন্ধে অনেক কাহিনী জনসমাজে প্রচলিত আছে। এই বাক্‌শক্তিশূন্য জীবগণ বুদ্ধি-বৃত্তির বলে অনেক সময়ে সাধারণ মনুষ্যদিগকেও অধঃকৃত করিয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার একজন ভ্রমণকারী স্বয়ং দেখিয়া লিখিয়াছেন, একদা একদল বানর একটী ক্ষুদ্র সরিৎ পার হইবার জন্য নদীকূলে উপস্থিত হয়। নদীর উভয় পার্শ্বে দুটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ বর্ত্তমান ছিল। বানর-দল এই বৃক্ষদ্বয় অবলম্বন করিয়া পার হইবার এক অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন করে। ইহাদের একটী প্রথমে তটদেশের বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক তাহার অগ্রবর্ত্তী শাখা পদদ্বয়ে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া আপনার দেহ সম্প্রসারিত করিল, পরে আর একটী বানর প্রথমটীর হস্তদ্বয় আপনার পদ-

দ্বয়ে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দেহ বিস্তারিত করিল; এইরূপে কতকগুলি বানর ক্রমান্বয়ে পরস্পরের হস্ত ও পদ আবদ্ধ করিয়া নদীর অপর তটস্থ বৃক্ষের শাখা দৃঢ়রূপে ধারণ করিল। অবশিষ্ট বানরগুলি স্বজাতির দেহ-নির্ম্মিত এই অপূর্ব্ব সেতুদ্বারা অপর পারে উপস্থিত হইল। পরে যে বানরগুলি আপনাদের দেহ প্রসারণ পূর্ব্বক সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহারা পর্য্যায়ক্রমে এক একটী করিয়া তটবর্ত্তী সঙ্গিদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে লাগিল। বানরদিগের এই অদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বার বার প্রশংসা করিতে হয়। রেঙ্গার নামে একজন প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ বানরদিগের মানসিক বৃত্তির প্রখরতার সম্বন্ধে কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, ইতর প্রাণিগণও প্রগাঢ় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। রেঙ্গার তাঁহার গৃহপালিত বানর-দিগকে কাগজের মোড়কে করিয়া মিছরি খণ্ড দিতেন। একদা তিনি মিছরির পরিবর্ত্তে পূর্ব্বের ন্যায় কাগজের মোড়ক করিয়া একটী সজীব বোলতা একটী বানরের হস্তে সমর্পণ করেন। বানর মিছরি মনে করিয়া যেমন সেই মোড়ক খুলিয়াছে, অমনি বোলতা তাহার গাত্রে দংশন করে। এই ঘটনার পর রেঙ্গার যতবার খাদ্য সামগ্রী পূর্ব্ববৎ কাগজের মোড়কে আবদ্ধ করিয়া সেই বানরকে দিয়াছেন, বানর ততবার উহা সাবধানে হস্ত দ্বারা উত্তোলন করিয়াছে, সাবধানে কর্ণের নিকট লইয়া উহার শব্দ পরীক্ষা করিয়াছে, এবং সাবধানে মোড়ক খুলিয়া খাদ্য সামগ্রী বাহির করিয়া লইয়াছে। বুদ্ধিবৃত্তির ন্যায় বানর দিগের অনুচিকীর্ষা ও কুতূহলপরতাও সবিশেষ বলবতী। একদা একটী বানর একজনকে প্রাতঃকালে দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্ত ধাবন করিতে দেখিয়া আপনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে দন্ত ধাবন করিত।

ব্রেম নামে একজন প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, এক সময়ে তাঁহার কতকগুলি প্রতিপালিত বানর ছিল। উহারা সর্প দেখিলে যার পর নাই ভীত হইত। এই প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের গৃহে বাক্স-বদ্ধ কতকগুলি সর্পও ছিল। বানরগণ যদিও সর্প দর্শনে সন্ত্রস্ত হইত, তথাপি কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য সময়ে সময়ে ঐ বাক্সের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সর্প গুলিকে অভিনিবেশ সহকারে দর্শন করিত। সুপ্রসিদ্ধ প্রাণি-বিদ্যা-বিশারদ ডার-উইন সাহেব একদা লণ্ডন নগরের পশ্বালয়স্থিত কতকগুলি বানরের সম্মুখে একটী মৃত সর্প নিক্ষেপ করেন, সর্পদর্শনে ভীত হইয়া বানরগণ প্রথমে ইতস্ততঃ পলায়িত হইল, কিন্তু পরে যখন জানিতে পারিল, নিক্ষিপ্ত সর্প সজীব নহে, তখন তাহারা একে একে সর্পের নিকটবর্ত্তী হইল, এবং আগ্রহ সহকারে সর্পের সমস্ত দেহ নিরীক্ষণ পুর্ব্বক আপনাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে লাগিল। অনেক স্থলে বানরগণ মানব জাতির কার্য্য-কলাপের এরূপ সুন্দর অনুকরণ করে যে, তাহা হঠাৎ দেখিলে সাতিশয় বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। স্ত্রাবো নামে গ্রীশ দেশের এক জন ইতিহাসবেত্তা এবিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। মাসিদনের মহাবীর সেকন্দর সাহ যখন সৈন্যগণ সমভি-ব্যাহারে ভারতবর্ষে উপনীত হন, তখন একদা বহুসংখ্য বানর বন হইতে বহির্গত হইয়া সেই মাসিদনীয় সৈন্যের সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান হয়। যুদ্ধ-সজ্জিত ও শত্রু-সম্মুখীন সৈন্যের অবস্থানের সহিত তাহাদের অবস্থানের অণুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় নাই। ইহাতে মাসিদনীয় সৈন্যগণের এমন মতিভ্রম হয় যে, তাহারা প্রকৃত শত্রু সেনা ভাবিয়া এই দলবদ্ধ বানরদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করে।

উপস্থিত বুদ্ধি ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি মানসিক গুণে হস্তী এবং

কুক্কুরও সবিশেষ প্রসিদ্ধ। একদা একজন মৃগয়ার্থী স্বীয় হস্তীতে আরোহণ পূর্ব্বক অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করেন। বনে প্রবেশ করিবার পরেই একটী সিংহ তাঁহার নেত্রপথে পতিত হয়। শিকারী অসাবধানতা প্রযুক্ত হঠাৎ হস্তীর পৃষ্ঠদেশ হইতে ভূপতিত হইয়া ভীম-দর্শন পশুরাজের ক্ষমতাযত্ত হন। হস্তী প্রভুর এই আকস্মিক বিপদ্ দর্শনে কর্ত্তব্য-বিমুখ হয় নাই। সে প্রত্যুৎপন্নমতি-প্রভাবে সমীপবর্ত্তী একটী বৃক্ষের কাণ্ড অবনত করিয়া এমন দৃঢ়তর বলের সহিত সিংহের পৃষ্টদেশে চাপিয়া ধরে যে, সিংহ তাহাতেই শিকারীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোমহর্ষণ ধ্বনি করিয়া গতাসু হয়। মৃগয়া সময়ে কুক্কুরগণও এইরূপ প্রত্যুৎপন্ন-মতি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া থাকে। একদা একজন শিকারী নদীর এক তটে থাকিয়া তটান্তরস্থিত দুটী হংসের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করেন। ইহাতে দুটী হংসেরই পক্ষদেশে গুলি প্রবেশ করে। শিকারী এই হংসদ্বয়কে আনিবার জন্য স্বীয় কুক্কুরকে ইঙ্গিত করেন। কুক্কুর প্রভুর আদেশ প্রতিপালনার্থ সন্তরণ দ্বারা অপর তটে উপনীত হইয়া একবারে দুটী হংসকেই একত্রে আনিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া একটী রাখিয়া আর একটীকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হয়। পাছে তাহার অনুপস্থিতিতে আহত হংস পলায়ন করে, এই আশঙ্কায় দুটীকে একবারে বধ করিয়া ক্রমান্বয়ে দুইবার নদী উত্তীর্ণ হইয়া এক একটীকে প্রভুর নিকট উপস্থাপিত করে।

টিপু সুলতানের রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ সময়ে একটী হস্তী যেরূপ কৌশলে একজন সৈনিক পুরুষকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করে, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে হস্তি-জাতির পরিণাম-দর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার যার পর নাই প্রশংসা করিতে হয়। ব্রিটিষ সেনাগণ যখন টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে

যুদ্ধযাত্রা করে, তখন কতকগুলি তোপ একটী বিশুষ্ক নদীর বালু-কাময় গর্ভ দিয়া নগরাভিমুখে সমানীত হইতেছিল। এই তোপ-সমূহের একটীর উপর একজন সৈনিক পুরুষ বসিয়াছিল। ঘটনাক্রমে উপবিষ্ট সৈনিক হঠাৎ এমন ভাবে অধঃপতিত হইল যে, কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই তোপের চক্র তাহার দেহের উপর দিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। পশ্চাতে একটী হস্তী আসিতেছিল, সহসা এই ভয়ানক ব্যাপার তাহার নেত্রগোচর হইল। বিচক্ষণ হস্তী কালবিলম্ব না করিয়া শুণ্ড দ্বারা তোপের চক্র উত্তোলিত করিল, এবং উহা অধঃপতিত সৈনিককে অতিক্রম করিলে পুন-র্ব্বার ধীরে ধীরে মাটিতে নামাইয়া দিল। হস্তী কামানটী তুলিয়া না ধরিলে চক্রসম্পেষণে সৈনিক পুরুষের মৃত্যু হইত।

অশ্বজাতিরও মনোবৃত্তি সাতিশয় বলবতী। বোডিলিযে নামে একজন সেনাপতির একটী অশ্ব ছিল। অশ্বটী সুশ্রী ছিল বটে, কিন্তু বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত তাহার দন্ত সকল ক্ষযিত হইয়া গিযা-ছিল, এতন্নিবন্ধন সে ঘাস বা দানা চর্ব্বণ করিতে পারিত না। স্বজাতীয়ের এই দুঃসময়ে পার্শ্বস্থিত অপর দুটী অশ্ব ঘাস ও দানা চর্ব্বণ করিয়া বৃদ্ধ অশ্বের সম্মুখভাগে ফেলিয়া দিত। বৃদ্ধ অশ্ব এই চর্ব্বিত ঘাস ও চূর্ণ চনক ভোজন করিয়া কিছুকাল জীবিত ছিল। পনি ঘোটকের স্মৃতিশক্তির সম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায। এস্থলে একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ইংলণ্ডের কোন সংবাদ-পত্র-বণ্টনকারীর একটী পনি ছিল। সে সংবাদপত্রের সমুদয় গ্রাহককেই উত্তমরূপে চিনিত। বণ্টনকারীর পীড়া হইলে একটী বালককে ঐ পনির উপর আরোহিত করিযা সংবাদ পত্র বণ্টন করিতে পাঠান হয। এই সময়ে সুযোগ্য ঘোটক প্রত্যেক গ্রাহকের দ্বারদেশে থামিযা সংবাদপত্র বিলি করিয়া দিয়াছিল। ইহাতে আরোহীর কোনরূপ ক্লেশ বা অসুবিধা হয় নাই।

কয়েক বৎসর হইল, ফরাসী ও প্রুসীয়দিগের মধ্যে যে ঘোর-তর সংগ্রাম হইয়াছিল, সেই সংগ্রাম সময়ে সুশিক্ষিত তির্য্যক-জাতি অসামান্য বুদ্ধি-চাতুরী প্রদর্শন করে। শত্রুসেনায় নগরী অবরুদ্ধ হইলে ফরাসিগণ সুশিক্ষিত কপোতের মুখে পত্র দিয়া ছাড়িয়া দিত, পত্রবাহক কপোত উড্ডীয়মান হইয়া এই পত্র যথাস্থানে উপস্থাপিত করিত। একদা ফরাসিগণ এইরূপ একটী কপোত ছাড়িয়া দিয়াছিল, এমন সময়ে বিপক্ষগণ এই কপোত-বাহিত পত্র ধৃত করিবার জন্য একটী শ্যেন পক্ষীকে ছাড়িয়া দিল। শ্যেন আকাশ-পথে উড্ডীন হইয়া পত্রবাহক কপোতকে সবলে আক্রমণ করিল। বুদ্ধিমান প্রতিপালক-হিতৈষী কপোত দেখিল, পত্র রক্ষার আর কোন উপায় নাই, সুতরাং সে কাল-বিলম্ব না করিয়া পত্রখানি গিলিয়া ফেলিল। কিন্তু ইহাতে কপোত পরিত্রাণ পাইল না। শ্যেনের আক্রমণে তাহার ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত ও জীবন বিনষ্ট হইল। পরিশেষে কপোতের গলদেশ ছিন্ন করিয়া পত্র বাহির করা হইল। একটী সদাশয়া ফরাসী-মহিলা এই হিতৈষী কপোতের হিতৈষিতার বিবরণ সুমধুর গীতিকায় নিবদ্ধ করিয়া তাহাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন।

বানর জাতির উপস্থিত বুদ্ধির সম্বন্ধে পূর্ব্বে একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। এইস্থলে আর একটী বানরের হিতৈষিতা, সুকৌশল ও বুদ্ধির আর একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। এই দৃষ্টান্ত ভিন্ন দেশ হইতে সংগৃহীত হয় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের দেশেই এই বিষয় সংঘটিত হইয়াছিল। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকে লোকের দ্বারে দ্বারে বানর নাচা-ইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এই সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিকে রাত্রি কালে কয়েকজন পাপাত্মা অর্থলোভে নিহত করে, এবং তাহার শব নিকটবর্ত্তী মাঠে প্রোথিত করিয়া রাখে। নিহত ব্যক্তির

প্রতিপালিত বানর অন্তরালে থাকিয়া এই সমস্ত ঘটনা দর্শন করে। রাত্রি প্রভাত হইলে বানর আর্ত্তনাদ করিতে করিতে নিকটবর্ত্তী থানায় উপস্থিত হয়, এবং পুলিসের সকল লোককেই সবলে বস্ত্র ধরিয়া আকর্ষণ করিতে থাকে। শান্তিরক্ষকগণ বানরের এই অদৃষ্টচর কার্য্য দর্শনে কৌতূহলী হইয়া তাহার সমভিব্যাহারে যায়। বানর এইরূপে শান্তিরক্ষকদিগকে সঙ্গে লইয়া নির্দ্দিষ্ট মাঠে উপনীত হয়, এবং যে স্থানে তাহার প্রতিপালনকর্ত্তার শব প্রোথিত ছিল, সেইস্থানে যাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে হস্ত দ্বারা মৃত্তিকা তুলিতে আরম্ভ করে। ইহা দেখিয়া শান্তিরক্ষকগণ স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা সেই স্থানের মৃত্তিকা খনন করিতে আরম্ভ করিল এবং কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই শব তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। শান্তিরক্ষকগণ পরিশেষে এই বানরের সাহায্যেই হত্যাকারিদিগকে ধৃত করে।

একজন সম্ভ্রান্ত ইংলণ্ডীয় মহিলা একটী কুক্কুটীর কৃতজ্ঞতার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "আমার ইয়ারিকো নামে একটী কুক্কুটী ছিল। তাহার প্রায় দশ বারটী শাবক হয়। আমি প্রত্যহ তাহাকে স্বহস্তে আহারীয় সামগ্রী দিতাম। ইয়ারিকো আহারে পরিতুষ্ট হইয়া শাবকগণের সহিত পরম সুখে কালাতিপাত করিত। একদা প্রাতঃকালে দেখিলাম, একটী শৃগাল ইয়ারিকোর সন্তানগুলিকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইয়ারিকো পক্ষপুট বিস্তারপূর্ব্বক শাবকগুলিকে পশ্চাতে রাখিয়া শৃগালের সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইয়ারিকোর সন্নিবেশ-ভঙ্গী ও তাৎকালিক অবস্থা দর্শনে স্পষ্টই প্রতীত হইয়াছিল যে, সে শৃগাল হস্তে আত্মসমর্পণ করিবে, তথাপি প্রাণাধিক সন্তানগুলিকে মৃত্যুমুখে পাতিত হইতে দেখিবে না। আমি এই ঘটনা দেখিবা মাত্র কালবিলম্ব না করিয়া আমার কুক্কুরকে ইঙ্গিত

করিলাম ; কুক্কুর তৎক্ষণাৎ মহাবেগে ধাবিত হইয়া ইয়ারিকোকে নিরাপদ করিল। এই অবধি আমি দেখিলাম. ইয়ারিকোর সহিত কুক্কুবের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছে। ইহাবা সর্ব্বদা একসঙ্গে আহার ও একসঙ্গে অবস্থান কবিত। ইযাবিকো কুক্কুবের প্রতি এরূপ কৃতজ্ঞ ছিল যে, সে কখনই কুক্কুবকৃত এই মহদুপকাব বিস্মৃত হয় নাই। ইযারিকোর শাবকগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক-বয়স্ক হইলে সর্ব্বদা তাহাদেব রক্ষাকর্ত্তা সেই কুক্কুরের সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। এক দিনেব জন্যও তাহারা কুক্কুরকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তবে গমন কবে নাই। তাহাদের মধ্যে যে প্রগাঢ় সদ্ভাব, অকৃত্রিম প্রীতি ও অবিচলিত মমতা আছে, তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইত।" এক জন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ইতর জীবদিগেব পবোপকার ও স্নেহেব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "একদা এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আপনাব আবাস বাটীব প্রাঙ্গণে শকট পবিচালনা করিতেছিলেন ; হঠাৎ শকটেব চক্র তাঁহার পালিত কুক্কুরের পাদদেশের উপব দিযা চলিযা গেল। কুক্কুর যাতনায অস্থিব হইয়া অঙ্গ সঞ্চালন করিতে লাগিল। কুক্কুরের এই কাতরতা দর্শনে নিকটবর্ত্তী একটী কাক তথায উপস্থিত হইযা করুণকণ্ঠে চীৎকাব করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই অবধি কাক কুক্কুরেব আহার জন্য প্রতিদিন মাংসখণ্ড আনিয়া দিত। ক্রমে কুক্কুরের চক্রনেমির আঘাত-জনিত ক্ষতস্থান সাতিশয় উৎকট হইয়া উঠিল, শাবীরিক বল ও তেজস্বিতা অন্তর্হিত হইতে লাগিল, এবং ক্রমে মৃত্যু-সময় নিকটবর্ত্তী হইল। এই সময়ে কাক কুক্কুবের আহাবান্বেষণ ব্যতীত আব কোনও কার্য্য উপলক্ষে স্থানান্তবে যাইত না, সর্ব্বদা বিষণ্ণচিত্তে ও কাতবভাবে কুক্কুবেব নিকট বসিযা থাকিত। একদা কাক আহার অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছে, তাহার আসিতে সন্ধ্যা অতীত হইল, ইত্যবসবে কুক্কুর-

রক্ষক সেই পীড়িত কুক্কুরটীকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া দ্বার রোধপূর্ব্বক চলিয়া গেল। কাক আসিয়া দেখিল, গৃহের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং সে অনন্যগতি হইয়া সমস্ত রাত্রি চঞ্চুপুটদ্বারা দ্বারের নিম্নস্থ ভূমি খনন করিতে লাগিল। পরহিতৈষী পরদুঃখকাতর কাকের প্রগাঢ় পরিশ্রমে ক্রমে দ্বারের নিম্নভাগে একটী গর্ত্ত প্রস্তুত হইল। কাক এই গর্ত্ত দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় কুক্কুর-রক্ষক তথায় সমাগত হইয়া এই অদৃষ্টচর ও অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে যার পর নাই বিস্মিত হইল।

উল্লিখিত উদাহরণ-পরম্পরা ইতর প্রাণিদিগের মনোবৃত্তির উৎকর্ষের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিতেছে। মানবগণ যে গুণের প্রভাবে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, যে গুণের প্রভাবে দেববাঞ্ছনীয় পবিত্র সুখের রসাস্বাদে সমর্থ হইতেছেন, যে গুণ তাঁহাদের হৃদয় অতুলনীয় ও অনবদ্য করিয়া তুলিতেছে, সামান্য প্রাণিজাতিতেও সে গুণ বিরল নহে। হায়! অনেকে সামান্য সুখের আশায় ঈদৃশ প্রাণীদিগকেও যাতনা দিতে কুণ্ঠিত হয় না, এবং অনেকে সামান্য জীবগণের মধ্যেও দয়া, ন্যায়পরতা ও হিতৈষিতার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাইয়াও আপনাদের উদ্দাম মনোবৃত্তি-সমূহকে পৈশাচিক ব্যাপার সাধনে নিয়োজিত করিতে সঙ্কোচ অবলম্বন করে না। দয়াময় জগদীশ্বর তাহাদিগকে যে সমস্ত অত্যুৎকৃষ্ট গুণগ্রামের অধিকারী করিয়াছেন, তাহারা অবলীলায় ও অসঙ্কোচে তৎসমুদয় পাদদলিত করিয়া ইতর প্রাণিগণ হইতেও ইতর ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। ঈশ্বরের অসীম সৃষ্টির মধ্যে শিক্ষাশূন্য, বাক্‌শক্তিশূন্য সামান্য জীবগণ এই সকল মানবগণ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, সন্দেহ নাই।

শিক্ষা।

শিক্ষা বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত ও হৃদয় সংস্কৃত করিবার একটী প্রধান উপায়। বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত না হইলে কল্পনা ও প্রতিভাব উচ্চতম গ্রামে আরোহণ করিয়া দেব-বাঞ্ছনীয় পবিত্র সুখ ভোগের অধিকারী হওয়া যায় না, এবং হৃদয় সংস্কৃত না হইলে সর্ব্বপ্রকার সাধুতা, সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষ ও সর্ব্বপ্রকার অনবদ্যতার মনোহর আভরণে সমলঙ্কৃত হইতে পারা যায় না। শিক্ষা প্রতিভা-শক্তিকে সুপ্রণালীক্রমে উন্মেষিত করে, এবং মানবী প্রকৃতিকে দেব ভাবান্বিত করিয়া তুলে।

শিক্ষাপ্রভাবে যাহার হৃদয় সংস্কৃত হয় নাই, বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় নাই, এবং বিবেক কর্ত্তব্য-পথ প্রদর্শনে অগ্রসর হয় নাই, সে পবিত্র মানব নামের যোগ্য নহে। জলধির অসীম বিস্তারে যেমন একই নীলিমা বিকাশ পায়, তাহার হৃদয় সেইরূপ অজ্ঞানের নিরবচ্ছিন্ন ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। সে কেবল ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হইলেই আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে। প্রকৃতির কার্য্য কারণের সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে, আপনার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের সূক্ষ্ম বিচারে তাহার মন নিয়োজিত হয় না। সে মহাসাগরের তরঙ্গমালা দর্শনে ভীত হয়, হিমালয়ের শৃঙ্গে মেঘসমূহের কালিমা দেখিয়া নয়ন মুদ্রিত করে, এবং গভীর বজ্রনাদ ও দিগদাহকারী দাবানলে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। এইসকল ভয়ঙ্কর দৃশ্য যে অসীম জড় জগতের অনন্তশক্তি বিকাশ করিতেছে, তাহা তাহার মস্তিষ্কে নীত হয় না, মানবগণ প্রতিভা ও কল্পনার প্রভাবে এই অনন্ত শক্তিকে করায়ত্ত করিয়া পৃথিবীতে যে অত্যদ্ভুত কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহা ভাবিয়া সে আনন্দ অনুভব করে না। কে তাহার সম্মুখে এই সকল ভীমকান্ত দৃশ্য প্রসারিত রাখিয়া-

ছেন, কাহার অসীম শক্তির প্রভাবে এই জড় জগৎ ব্যবস্থাপিত হইয়া আপনার শক্তি প্রকাশ করিতেছে, তাহা সে একবারও অনুধাবন করে না। সে কূর্ম্মের ন্যায় আপনাতেই আপনি লুক্কায়িত থাকিয়া জীবিত কাল পর্য্যবসিত করে। সে বৃক্ষের অনায়াস-লব্ধ ফল ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, সুপরিষ্কৃত নির্ঝর-বারি পান করিয়া তৃষ্ণা শান্তি করে, এবং অবলীলায় ও অসঙ্কোচে নানা প্রকার জুগুপ্সিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। কিছুতেই তাহার চরিত্র সংগঠিত হয় না, জীবিত-প্রয়োজন সংসাধিত হয় না, এবং বুদ্ধি বৃত্তি পরিমার্জ্জিত হইয়া সৎপথ অবলম্বন করে না। সে অজ্ঞানাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, এবং অজ্ঞানাবস্থাতেই কালাতিপাত করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়া থাকে।

কিন্তু সুশিক্ষা যাহাকে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ গুণগ্রামে অলঙ্কৃত করিয়াছে, তিনি পৌর্ণমাসী রজনীর জ্যোৎস্না-বিধৌত কুমুদস্থলের ন্যায় পবিত্র ও কলঙ্কশূন্য। তিনি নরলোকে থাকিয়াও দেবলোকের পবিত্র সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। পবিত্র চরিত্রের বলে, গভীর দূরদর্শিতার সাহায্যে এবং সুস্থির বিবেক-বুদ্ধির প্রসাদে তিনি আপনার কর্ত্তব্য যথারীতি সম্পাদন করিয়া বিনশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করেন। কিছুতেই তাঁহার সাধনা প্রতিহত হয় না, এবং কিছুতেই তাঁহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি অবনত হইয়া পড়ে না। তিনি কখনও ভূলোক হইতে সৌর জগতে উপস্থিত হইয়া গগন-বিহারী গ্রহগণের কার্য্য সন্দর্শন পূর্ব্বক পুলকিত হন, কখন পার্থিব জগতে অবতরণ পূর্ব্বক প্রকৃতির গূঢ় তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া সকলকে বিস্ময়ে অভিভূত করেন, কখন অজ্ঞান ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে জ্ঞানালোকে আলোকিত ও পবিত্রতার স্বর্গীয় সৌরভে আমোদিত করিয়া

তুলেন, এবং কখন মূর্ত্তিমতী দয়া ও ন্যায়পরতা হইয়া রোগাতুরকে পথ্য, শোক-সন্তপ্তকে সান্ত্বনা ও উচ্ছৃঙ্খলকে সদুপদেশ দিয়া সম্প্রীত করিয়া থাকেন। তাঁহার হৃদয়-সাগর অটলতা ও নির্ভীকতায় আতট পূর্ণ থাকে, তাঁহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি সুখে দুঃখে সুসময়ে দুঃসময়ে অটল গিরিবরের ন্যায় সদা উন্নত রহে, এবং তাঁহার ন্যায়পরতা ও দূরদর্শিতা সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তির দুশ্ছেদ্য আবরণ উন্মুক্ত করিতে সদা যত্নপর হইয়া থাকে। তিনি এইরূপে পবিত্রতার মনোহর আভরণে ভূষিত হইয়া সাধারণের অচিন্ত্য, অগম্য ও অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব আনন্দ-প্রবাহে অভিষিক্ত হইতে থাকেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সুশিক্ষাবলে বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত ও হৃদয় সংস্কৃত হইয়া থাকে। যাহার হৃদয় সংস্কৃত হয় নাই, চরিত্র সংগঠিত হয় নাই এবং পবিত্রতা যাহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় নাই, সে কখনও সুশিক্ষিত বলিয়া গণনীয় নহে। যখন দেখিব, এক জন সাহিত্যে অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে, গণিতে অনন্য-সাধারণ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া সকলকে চমকিত করিতেছে, দর্শনের জটিল অর্থ উদ্ভেদ করিয়া আপনি মহাপ্রজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী বলিয়া সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ হইতেছে, কিন্তু পরক্ষণেই যদি সে মূর্ত্তিমতী পাপ-প্রবৃত্তি হইয়া অত্যাচার ও অবিচারে সমাজকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলে, তাহা হইলে আমরা তাহাকে অশিক্ষিত বলিয়াই কাতর নয়নে চাহিয়া দেখিব। যে মস্তিষ্কের শক্তিতে মহীয়ান্ হইয়াও হৃদয়ের শক্তিকে উপেক্ষা করে, সে সুশিক্ষিত নহে, সুশিক্ষিত নামের কলঙ্ক মাত্র, এবং ঈদৃশী শিক্ষাও সুশিক্ষা নহে, কুশিক্ষার অপবিত্র ছায়ামাত্র।

হৃদয়ের শক্তি মার্জ্জিত ও উন্নত করা যেমন সুশিক্ষার প্রয়োজন, সেইরূপ স্বাবলম্বন-বলে অন্য সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া

যথানিয়মে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করাও সুশিক্ষার একটী প্রধান উদ্দেশ্য। যে শিক্ষায় স্বাবলম্বন-শক্তির উন্মেষ হয় না, তাহা প্রকৃত "শিক্ষা" পদের বাচ্য নহে। স্বাবলম্বন মনুষ্যকে সর্ব্বদা উন্নত, অবিচলিত ও অনমনীয় রাখে। আত্মাবলম্বন না থাকিলে কখনই কেহ কোন দুরূহ কার্য্য সাধন করিয়া উন্নতি লাভে সমর্থ হয় না, এবং স্বাধীনতার সুখময় ক্রোড়ে লালিত হইয়া অমর-স্পৃহণীয় পবিত্র সুখ আস্বাদ করিতে পারে না। আত্মাবলম্বন ও আত্মাদর থাকিলে লোকে যে অবস্থাতেই পতিত হউক না কেন, সেই অবস্থায় থাকিয়াই অসঙ্কুচিত চিত্তে আপনার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে।

হৃদয়ের শক্তির পরিমার্জ্জন এবং আত্মাবলম্বন ও আত্মাদরের উন্নতি সাধনের সহিতই সুশিক্ষার প্রয়োজন পর্য্যবসিত হয় না। এই সকলের সহিত পরমাত্মনিষ্ঠা ও চিত্ত সংযমের সংযোগ থাকা আবশ্যক। পরমাত্মনিষ্ঠ ও সংযতচিত্ত না হইলে শিক্ষা প্রগাঢ় ও কর্ত্তব্য বুদ্ধির উদ্দীপক হয় না। "মনুষ্য অপূর্ণ, অসমর্থ ও অসংখ্য অভাব-বিশিষ্ট"। পরমাত্মনিষ্ঠায় এই অপূর্ণতায় পূর্ণতা, অসামর্থ্যে সামর্থ্য এবং অভাবে বিষয়-প্রাপ্তি কিয়দংশে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে হৃদয় ঐশ্বরিক-তত্ত্বে সমাকৃষ্ট নহে, সে হৃদয় বিশুষ্ক ও সে হৃদয় চিরশোভা-হীন, যিনি সিদ্ধিদাতা ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে সংসারে বিচরণ করেন, তিনি প্রকৃত-শিক্ষা-বিরহিত ও প্রকৃত সাধনা-শূন্য। প্রশান্ত রজনীর সুনীল আকাশ প্রকৃতির কমনীয় কান্তি শত গুণে উজ্জ্বল করিতেছে, "দিব্য লাবণ্য-শোভিত" পূর্ণ-চন্দ্র সুস্নিগ্ধ কিরণে চারি দিক্ হাস্যময় করিয়া তুলিতেছে, তরঙ্গিণী জ্যোৎস্না-রঞ্জিত হইয়া কলস্বরে সাগরের অভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে, এই সকল সুন্দর দৃশ্য সকলেই দেখিয়া থাকে। কিন্তু প্রশান্ত আকাশ দেখিলে

যাহার হৃদয় পবিত্র ভাবে সম্প্রসারিত হয়, কমনীয় মূর্ত্তি শশধরের হাস্য দেখিয়া যাঁহার হৃদয় হাসিতে থাকে, স্রোতস্বতীর বিমল বারি-রাশির সহিত যিনি স্বীয় অশ্রু-প্রবাহ মিশাইয়া তদ্গতচিত্তে সেই সর্ব্বশক্তিমান্, অনাদি, অনন্ত পরম দেবতার জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করেন, তিনিই প্রকৃত শিক্ষিত ও তিনিই প্রকৃত সাধু। তিনি মানব হইয়াও দেবভাবে পরিপূর্ণ থাকেন, এবং মর্ত্ত্যবাসী হইয়াও অমরবাসের সুখস্বাদে পরিতৃপ্ত রহেন। তাঁহার সুমধুর দেব-প্রকৃতি সর্ব্বদা অতুলনীয় ও স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে চিরপরিপূর্ণ।

দূর শ্রবণ-যন্ত্র (টেলিফোন্)।

টেলিফোন্ অথবা দূর শ্রবণ-যন্ত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর একটী প্রধান বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া। তাড়িত বার্ত্তাবহ যেমন চক্ষুর নিমিষে বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে সংবাদ বহন করিয়া আনে, এই যন্ত্রও তেমনি বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে শব্দ বহন করিয়া লোকের শ্রুতি-বিবরে প্রবেশিত করিয়া থাকে। সুতরাং কেহ দূরতর স্থানে থাকিলেও এই যন্ত্রের সাহায্যে তাহার সহিত কথোপকথন করা সুসাধ্য হইয়া উঠে।

আমেরিকাবাসী বেল সাহেব এই অদ্ভুত দূর শ্রবণ-যন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা*। যন্ত্রটী অতি সামান্য ও স্বল্পব্যয় সাধ্য। স্বল্পব্যয়-

* বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নির্ম্মাণ-কারক এডিসনও দূর শ্রবণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশে যে দূর শ্রবণ-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহা বেল সাহেবের নির্ম্মিত। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য, এই এডিসন তড়িদালোক দ্বারা নগর প্রভৃতি আলোকিত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইঁহার উদ্ভাবনী শক্তি প্রভাবে অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। অন্যতম যন্ত্রের নাম স্বর সংরক্ষক (ফনোগ্রাফ্)। এই যন্ত্রের সম্মুখে কেহ কোন স্বরে কথা কহিলে, যে সময়েই হউক, যন্ত্র হইতে সেই স্বরে সেই কথা বহির্গত করিতে পারা যাইবে।

সাধ্য বলিয়া ইহা সাধারণের বিলক্ষণ ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে। যন্ত্রটী এইরূপ, একটী চোঙের মত কাঠের ফ্রেমের কিছু নিম্নে এক খানি বৃত্তাকার লৌহপাত ঐ ফ্রেমে সংলগ্ন থাকে, এই লৌহ পাতের কিছু নিম্নে এক খানি চুম্বক ও তাহাতে কতকগুলি জড়ান তার সন্নিবেশিত রহে। এতদ্ব্যতীত উক্ত যন্ত্রে আর কোন দ্রব্যের সমাবেশ নাই। সুতরাং বৃত্তাকার লৌহপাত, চুম্বক ও তার দূর শ্রবণ-যন্ত্রের প্রধান উপাদান।

সিংহল দ্বীপবাসিগণ এক সময়ে কিয়দ্দূরে থাকিয়া পরস্পর কথোপকথন করিবার জন্য সূক্ষ্ম চর্ম্মাচ্ছাদিত এক একটী বাঁশের চোঙ্ আপনাদের নিকট রাখিত। এই উভয় চোঙের চামড়া একগাছি সূতা দ্বারা সংযুক্ত থাকিত। কথোপকথনের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে একব্যক্তি একটী চোঙে মুখ দিয়া বাক্য উচ্চারণ করিত, অপর ব্যক্তি দূরে থাকিয়া অন্য চোঙ্টী কর্ণে দিলে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির উচ্চারিত বাক্য স্পষ্ট শুনিতে পাইত। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে এই শ্রবণ-যন্ত্র প্রণালীর তত্ত্ব স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। শব্দ সকল নিরবচ্ছিন্ন কম্পন মাত্র। তর্জ্জনী দ্বারা সন্তাড়িত হইলেই তন্ত্রীর তার সমূহ হইতে মৃদু মধুর ধ্বনি নির্গত হইয়া থাকে। মুখ হইতে যে শব্দ নির্গত হয়, তাহাও বায়ুর সংঘাত-জনিত এক প্রকার কম্পন। মানব-কণ্ঠস্থ সূক্ষ্ম ও সচ্ছিদ্র চর্ম্মের অভ্যন্তর প্রদেশ দিয়া শ্বাস-নালীস্থ বায়ু সবেগে নির্গত হইলে উক্ত চর্ম্ম কম্পিত হইতে থাকে। এই কম্পন বায়ু প্রবাহে সঞ্চালিত হইয়া কর্ণ-পটহে আঘাত করিলে কর্ণপটহও কম্পিত হয়। কর্ণ-পটহের কম্পন শিরা দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হইলে বাক্য শ্রুত হইয়া থাকে। এক্ষণে যে চোঙের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতেও এই নৈসর্গিক প্রক্রিয়ার কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। একটী চোঙে মুখ দিয়া শব্দ

উচ্চারণ করিলেই সেই চোঙের অভ্যন্তরস্থ বায়ু কম্পিত হইয়া উঠে। চর্ম্মাবরণের এই কম্পনে তৎসংযুক্ত সূত্র একবার সটান ও একবার শিথিল হইতে থাকে, সূত্রের এইরূপ সঞ্চালনে অপর চোঙের মুখ-স্থিত চর্ম্মও কম্পিত হয়। সুতরাং মূল কণ্ঠ-স্বরের কম্পন প্রথম চোঙের চর্ম্মাবরণ ও সূত্র দ্বারা চালিত হইয়া দ্বিতীয় চোঙের চর্ম্মাবরণে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাকে কম্পিত করে, এই শেষোক্ত কম্পন বায়ু-প্রবাহ বশে অপরের কর্ণ-পটহে চালিত হওয়াতে শব্দ-শ্রুত হইয়া থাকে।

এই বংশ-নির্ম্মিত চোঙের কার্য্য-প্রণালীর সহিত দূর-শ্রবণ যন্ত্রের কার্য্য-প্রণালীর কিয়দংশে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। উভয় যন্ত্রেই কণ্ঠস্বরের কম্পন এক পাতলা পাত হইতে অপর পাতে সঞ্চালিত হয়। কেবল একটীতে চর্ম্মময় পাত অপরটীতে লৌহ-ময় পাত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু কেবল এই অংশে দূর শ্রবণ-যন্ত্রের সহিত সিংহল-বাসিদের ব্যবহৃত যন্ত্রের বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয় না, অপর বিষয়েও উভয়ের মধ্যে গুরুতর বিভিন্নতা আছে। সূত্র বংশময় চোঙের শব্দ-সঞ্চালক, তড়িৎ দূর শ্রবণ-যন্ত্রের শব্দ-বাহক, অর্থাৎ বংশ নির্ম্মিত চোঙে শব্দ প্রবেশিত করিলে সেই শব্দ চোঙ্-সংযুক্ত সূত্রের আকুঞ্চন ও সম্প্রসারণে অপর চোঙে প্রবিষ্ট হয়, দূর শ্রবণ-যন্ত্রে শব্দ প্রবেশিত করিলে সেই শব্দ যন্ত্র-সংযুক্ত তার দিয়া তাড়িত প্রবাহের বলে সঞ্চালিত হইয়া অপর যন্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। যে কম্পনে শব্দের উৎপত্তি হয়, তাহা অধিক সূতা টানিতে পারে না, সুতরাং তাহাতে অধিক দূরের কথাও শ্রুতি-বিবরে প্রবিষ্ট হয় না। কিন্তু দূর শ্রবণ-যন্ত্র ঈদৃশী প্রণালীর নহে। তাড়িত বেগের প্রভাবে এতদ্দ্বারা বহু দূরবর্ত্তী দেশস্থ লোকের কথাও অবলীলায় শুনিতে পারা যায়।

কি প্রকারে দূর শ্রবণ-যন্ত্রে তাড়িতের উৎপত্তি হয় এবং কি প্রকারে তাহা আপনার অসাধারণ ক্ষমতা বিকাশ করিয়া নেত্র পথাতীত স্থান হইতে শব্দ-বহন করিযা আনে, তাহা বলিবার পূর্ব্বে চুম্বকের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। চুম্বক, লৌহাকর্ষক ধাতব-দণ্ড বিশেষ। পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইযাছে যে, একটী তার স্ক্রুপের মত জড়াইযা তাহার অভ্যন্তরে তাড়িৎস্রোতঃ প্রবাহিত করিলে সেই তার নির্ম্মিত স্ক্রুপটী চৌম্বক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ উহা চুম্বকের ন্যায় লৌহাকর্ষণ প্রভৃতি সকল কার্য্যই করিয়া থাকে। অ্যাঁপের নামে একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত স্থির করিযাছেন, এক খণ্ড চুম্বকের চারি-দিকেও তাড়িৎ-স্রোতঃ বৃত্তাকারে বর্ত্তমান থাকে; বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা বলে ইহাও নির্ণীত হইযাছে যে, একখণ্ড চুম্বকে তার জড়াইযা আর একখণ্ড চুম্বক সহসা তাহার নিকটে আনিলে অথবা তাহার নিকট হইতে দূরে লইযা গেলে ঐ তারে তড়িৎ সঞ্চালিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে দূর শ্রবণ-যন্ত্রে কি প্রকারে তাড়িত প্রবাহের উদ্ভব হয, তাহা উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক সত্য দ্বারা হৃদযঙ্গম হইবে। পূর্ব্বে উক্ত হইযাছে, দূর শ্রবণ-যন্ত্রে এক খানি লৌহপাত ও তাহার অনতিনিম্নে এক গাছি তার-জড়ান চুম্বক থাকে। লৌহপাত খানি চুম্বকের নিকটবর্ত্তী বলিযা উহা সর্ব্বাংশে চৌম্বক ধর্ম্মাক্রান্ত। এরূপ স্থলে এক জনে এই লৌহপাতের উপর কথা কহিলে, তাহার কণ্ঠস্বরে বাযু কম্পিত হইবে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে লৌহপাতও কম্পিত হইযা উঠিবে। অর্থাৎ লৌহ-পাত একবার চুম্বকের নিকটে যাইবে, আবার তাহা হইতে সরিযা আসিবে। কিন্তু পূর্ব্বে উক্ত হইযাছে, লৌহপাত চৌম্বক গুণাক্রান্ত; সুতরাং এক খানি চুম্বকে যে যে কার্য্য নিষ্পন্ন হয়,

উক্ত লৌহপাতেও সেই সেই কার্য্য সংসাধিত হইবে। একবার বলা হইয়াছে, এক খণ্ড চুম্বক সহসা আর এক খণ্ড তার-জড়িত চুম্বকের নিকটে আসিলে বা তাহা হইতে সরিয়া গেলে ঐ তারে তড়িৎ-স্রোতঃ প্রবাহিত হয়। এই তড়িৎ-স্রোতঃ এক দিকে প্রবাহিত হয় না, চুম্বক নিকটে আসিলে উক্ত স্রোত যে দিকে যায়, দূরে গেলে তাহার বিপরীত দিকে যাইয়া থাকে। সুতরাং শব্দ উচ্চারিত হইলে লৌহপাত যেমন কম্পিত হইবে, চুম্বক-জড়িত তারের তাড়িত স্রোতও একবার এক দিকে আর বার তাহার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইতে থাকিবে। এই উভয় বিধ তাড়িত প্রবাহ তার দ্বারা অপর একটী দূর শ্রবণ-যন্ত্রের লৌহপাতে সংক্রান্ত হইয়া তাহাকেও কম্পিত করে। এই শেষোক্ত লৌহপাতের কম্পন বায়ু দ্বারা অপরের কর্ণ-পটহে চালিত হইলে বক্তার কথা গুলি শুনা গিয়া থাকে। বক্তা যত দূরবর্ত্তী দেশেই বাস করুন না কেন, দূর শ্রবণ-যন্ত্রে কথা কহিলে শ্রোতা আর একটী যন্ত্র কর্ণে লাগাইয়া তাঁহার সমস্ত কথাই শুনিতে পাইবেন। বলা বাহুল্য, এই উভয় যন্ত্র পরস্পর তার দ্বারা সংযোজিত থাকা আবশ্যক।

দূর শ্রবণ-যন্ত্রের কার্য্য-প্রণালীর সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইল, তাহার সারাংশ এই, এক জনে এই যন্ত্রে মুখ দিয়া কথা কহিল, তাহাতে এক খানি লৌহপাত কাঁপিয়া উঠিল, এই কম্পনে চুম্বক-জড়িত তারে তাড়িত প্রবাহ সংক্রামিত হইল, এবং এই তড়িৎ স্রোতঃ উক্ত তার দিয়া সঞ্চালিত হইয়া অপর স্থানস্থ শ্রোতা যে যন্ত্রটী কর্ণে সংলগ্ন রাখিয়াছে, তাহার এক খানি লৌহপাত কাঁপাইল। একবিধ কম্পনে একরূপ শব্দেরই উৎপত্তি হইল। সুতরাং শ্রোতা বক্তার কথা গুলি সুস্পষ্ট শুনিতে পাইল।

বিজ্ঞানের গরীয়সী শক্তি-প্রভাবে যে, এইরূপ কত শত অদ্ভুত

ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। মানবী প্রতিভা বলে প্রকৃতির অভাবনীয় শক্তি এইরূপে কার্য্যকারিণী হইয়া প্রাণি-জগতের সমূহ মঙ্গল সাধন করিতেছে।

নানক।

বাবা নানক অথবা নানক সাহ শিখ-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও আদি গুরু। নানকের জীবন-চরিত অনেক ভাষায় অনেক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। এই জীবনবৃত্তের সহিত অনেকগুলি অলৌকিক বা অসাধারণ ঘটনার সংমিশ্রণ দৃষ্ট হয়। যাঁহারা পরিদৃশ্যমান জগতের সমক্ষে আপনাদের প্রভাব প্রকাশ করেন, ঐশী শক্তি যাঁহাদিগকে উৎকৃষ্ট গুণে ভূষিত করিয়া কোন অসামান্য কর্ম্ম সম্পাদনে নিয়োজিত করে, মানব-কল্পনা প্রায় তাঁহাদের কার্য্য-পরম্পরাকে ঘটনা-বৈচিত্র্যে ও অতিশয়োক্তিতে আচ্ছন্ন করিয়া তুলে। নানক ধর্ম্ম-জগতে সেরূপ ক্ষমতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে যে নানা প্রকার কিম্বদন্তী প্রচারিত হইবে, তাহা বিস্ময়-জনক নহে। শিখগণ আপনাদের ধর্ম্মগুরুর মহিমা পরিবর্দ্ধিত ও ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহাতে কখনও বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। নানকের জন্ম-গ্রহণের সমকালে অদূরে মহতী জনতার আনন্দোৎসব, শৈশবে সর্পকর্ত্তৃক ছায়া প্রদান, যৌবনে বিশুষ্ক জলাশয়ে জলোচ্ছ্বাসের আবির্ভাব প্রভৃতি অনেক ঘটনায় অমানুষত্ব ও সর্ব্বশক্তিময় দেবত্ব মিশ্রিত আছে। এরূপ ঘটনায় সাধারণের বিশ্বাস জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং এস্থলে তৎসমুদয়ের উল্লেখেরও আবশ্যকতা নাই।

১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের দশ মাইল দক্ষিণবর্ত্তী কানাকুচা গ্রামে নানকের জন্ম হয়। কোন কোন মতে ইরাবতী ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্ত্তী তলবন্দী গ্রামে নানক জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু অন্যান্য মতের সহিত ইহার একতা লক্ষিত হয় না। তলবন্দী গ্রামে নানকের পিত্রালয় ছিল। নানক কানাকুচা গ্রামে তাঁহার মাতামহের আলয়ে ভূমিষ্ঠ হন। নানকের পিতার নাম কালুবেদী। কালুবেদী ক্ষত্রিয় বংশোৎপন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ। "বেদী" উপাধির সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, প্রসঙ্গ-সঙ্গতিক্রমে এস্থলে তাহা যথাবৎ লিখিত হইল।

রামচন্দ্রের পুত্র কুশ ও লব যথাক্রমে কুশাবতী ও লবকোট নামে দুটী নগর স্থাপন করেন। লবকোট বর্ত্তমান সময় লাহোর নামে পরিচিত। কুশাবতী ফিরোজপুরের দ্বাদশ মাইল অন্তরে অবস্থিত ছিল। কুশ ও লবের বংশধরগণ এই কুশাবতী ও লাহোরে নির্ব্বিবাদে অনেক কাল অবস্থান করেন। কালক্রমে কুলপুত্র কুশাবতীতে এবং কুলরাও লবকোটের শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় উভয়ের মধ্যে বিষম শত্রুতা জন্মিল। কুশাবতীর অধিপতি কুলপুত্র বহুসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া লাহোর অধিকার করিলেন। কুলরাও এইরূপে পরাভূত ও রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া দক্ষিণাপথের অধিপতি অমৃতের শরণাগত হইলেন। মহারাজ অমৃত শরণাগতের যথোচিত আদর সহকারে অভ্যর্থনা করিলেন, সৌজন্য ও সহৃদয়তার সহিত তাঁহাকে স্বীয় দুহিতা সমর্পণ করিলেন, এবং অন্তিম সময়ে বিপুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী করিয়া পরলোকগত হইলেন। অমৃতের তনয়ার গর্ভে সদীরাও নামে কুলরাওর একটী পুত্রসন্তান জন্মিল। পিতার লোকান্তর গমনের পর সদীরাও দক্ষিণাপথের অধিপতি হইয়া আর্য্যাবর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিলেন।

একদা প্রধান অমাত্য সদীরাওকে কহিলেন, "আপনি অসংখ্য জনপদের অধিস্বামী হইয়াছেন বটে, কিন্তু আপনার পৈত্রিক রাজ্য হস্তগত হয় নাই। আপনার পৈত্রিক রাজ্য পঞ্জাব। আপনার পিতা কুলপুত্র কর্তৃক ঐ স্থান হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছিলেন।" সদীরাও প্রধান অমাত্যের নিকট এই বিবরণ শুনিয়া সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে লাহোরে যাত্রা কবিলেন, এবং কুলপুত্রকে যুদ্ধে পরাস্ত কবিযা পৈত্রিক সিংহাসনেব অধিকাবী হইলেন।

কুলপুত্র বাজ্যভ্রষ্ট ও শ্রীভ্রষ্ট হইযা পবিব্রাজকবেশে নানা-স্থানে ভ্রমণ করিয়া পবিশেষে পুণ্য-ভূমি বাবাণসীতে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে তিনি বেদাধ্যযনে প্রবৃত্ত হন। একদা বেদ পড়িতে পডিতে কুলবাও দেখিতে পাইলেন, বেদে এই কথাটী লিখিত আছে, "দৌরাত্ম্য করা মহাপাপ, মনুষ্য দৌবাত্ম্য করিলে কখনই দয়ার আশা কবিতে পারে না।" এই উপদেশ বাক্য কুলপুত্রেব হৃদযে আঘাত করিল। তিনি দৌরাত্ম্য কবিযা ভ্রাতাকে বাজ্য হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছিলেন বলিযা সাতিশয ম্রিয়মাণ হইলেন। কুলবাও আর বারাণসীতে থাকিতে পারি-লেন না। দুঃখিত হৃদয়ে স্বকৃত পাপের ক্ষমা প্রার্থনা কবিতে সদীরাওব নিকটে উপস্থিত হইবার সঙ্কল্প কবিলেন।

কুলপুত্র লাহোরে উপস্থিত হইযা সদীবাওর সমক্ষে বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং পাঠ সমাপ্ত কবিযা স্বীয় দুষ্কৃতেব ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সদীরাও পিতৃব্যের মুখে বেদ শুনিয়া সাতিশয হৃষ্টচিত্তে তাঁহার সমস্ত অপবাধ বিস্মৃত হইয়া নিজের সিংহাসন তাঁহাকে সমর্পণ কবিলেন। এইরূপে কুলপুত্র পুনর্ব্বাব লাহোরেব সিংহাসনে আসীন হইলেন, এবং বেদ পাঠ করিযা-ছিলেন বলিযা "বেদী" উপাধি লাভ কবিলেন। এই অবধি কুলপুত্রের বংশধবগণেরও উপাধি "বেদী" হইল। নানকের

পিতা কালু এই বংশের সন্তান বলিয়া "বেদী" উপাধি দ্বারা অলঙ্কৃত হন।

নানক অল্পবয়সে অল্পসময়ের মধ্যে গণিত ও পারস্য বিদ্যা আয়ত্ত করেন। তিনি স্বভাবতঃ শুদ্ধাচারী ও চিন্তাশীল ছিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই সাংসারিক কার্য্য ও সাংসারিক ভোগ-সুখে তাঁহার সাতিশয় বিতৃষ্ণা জন্মিল। কালুবেদী পুত্রকে সংসার-ধর্ম্মে আনয়ন করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইলেন, নিজ হইতে চল্লিশটী টাকা দিয়া লবণের ব্যবসায় আরম্ভ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী বা সে অনুরোধ প্রতিপালিত হইল না। নানক পিতৃদত্ত মুদ্রায় খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত সন্ন্যাসিদিগকে ভোজন করাইয়া অপার আনন্দলাভ করিলেন।

নানক যৌবনাবস্থাতেই হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সমস্ত ধর্ম্মানুশাসন এবং বেদ ও কোরাণের সমস্ত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলেন এবং সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা ও প্রগাঢ় শাস্ত্র-জ্ঞান-বলে উদার ও পরিশুদ্ধ মত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সমস্ত অন্ধ বিশ্বাস ও সমস্ত কুসংস্কারময় লৌকিক ক্রিয়া-কাণ্ডের উপর নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। যাহাতে হৃদয়ের শান্তিলাভ হয়, যাহাতে পবিত্র ও উদার ঐশ্বরিক তত্ত্ব প্রচারিত হয়, তাহাই জীবনের সার ধর্ম্ম বলিয়া তাঁহার নিকট বিবেচিত হইল। প্লেতো ও বেকন যেরূপ সমস্ত দর্শন-শাস্ত্র আন্দোলন করিয়াও প্রকৃত জ্ঞানের ভিত্তিতে নানাবিধ জঞ্জাল দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, নানকও সেইরূপ সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে ও ধর্ম্মপদ্ধতিতে নানাবিধ কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িলেন। তিনি সন্ন্যাসিবেশে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করিলেন, অনেক সাধু ও যোগিদিগের সহিত আলাপ করিলেন, আরবের

উপকূল অতিবাহিত করিয়া ফকীরদিগের কার্য্যকলাপ দর্শন করিলেন, কিন্তু কোথাও পবিত্র সত্যের আভাস দেখিতে পাইলেন না। সকল স্থানেই কুসংস্কারের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি, সকল স্থানেই কর্ম্মকাণ্ডের শোচনীয় বিকার দেখিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি এক্ষণে জাতিগত, সম্প্রদায়গত ও অনুশাসনগত সমস্ত বৈষম্য দূরীভূত করিয়া উদার সমদর্শিতা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে সচেষ্ট হইলেন। স্বদেশে আসিয়া তিনি সন্ন্যাস ধর্ম্ম ও সন্ন্যাসিবেশ পরিত্যাগ করিলেন। গুরুদাসপুর জেলায় ইরাবতীর তটে "কীর্ত্তিপুর" নামে একটী ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত হইল। নানক স্বীয় উদার মত প্রচার করিয়া অনেক শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কীর্ত্তিপুর ধর্ম্মশালায় তিনি সপরিবারে এই শিষ্য সম্প্রদায়ে পরিবৃত্ত হইয়া জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করেন। ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে এই স্থানেই বাবা নানকের পবিত্র জীবন-স্রোত অচিন্ত্য, অগম্য, স্বর্গীয় অমৃত প্রবাহে মিশিয়া যায়। নানক লোদীবংশের অভ্যুদয় সময় প্রাদুর্ভূত হন, এবং মোগলবংশের অভ্যুদয়ের পর মানবলীলা সম্বরণ করেন। ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ধর্ম্ম চিন্তায় তাঁহার জীবিতকালের যাটিবৎসর পাঁচ মাস ও সাত দিন অতিবাহিত হইয়াছিল।

নানকের মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ লইয়া তদীয় হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যদিগের মধ্যে ঘোরতর বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। হিন্দুগণ দাহ করিতে ইচ্ছা করে, এবং মুসলমানগণ সমাধি দিতে প্রস্তুত হয়। এই উভয় দলই বলপূর্ব্বক শব লইবার আশয়ে আস্তরণপট তুলিয়া দেখে যে, শব নাই। গোলযোগের সময় শিষ্যগণের কেহ অবশ্যই উহা স্থানান্তরিত করিয়াছিল। যাহা হউক, অনন্তর উভয় দল, যে আস্তরণে শব আচ্ছাদিত ছিল,

তাহা দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একখণ্ড অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার বিধি অনুসারে দাহ, অপর খণ্ড রীতিমত উপাসনার পর সমাধিস্থ করিল। এই দাহ-স্থলের উপর মঠ ও সমাধি-ভূমির উপর স্তম্ভ নির্ম্মিত হইল। এক্ষণে এই উভয় স্মৃতি-মন্দিরের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। বেগবতী ইরাবতীর অনন্ত-প্রবাহ ইহাকে সর্ব্ব সংহারক কালের কুক্ষিশায়ী করিয়াছে।

নানক যে পবিত্র ও উদার ধর্ম্ম-পদ্ধতি প্রচার করেন, তাহার আলোক প্রথমে পঞ্জাবের দৃঢকায, বলিষ্ঠ ও সবল স্বভাব জাঠগণের মধ্যে প্রসারিত হয়। ক্রমে মুসলমানগণও এই ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া উঠে। নানক সুলক্ষণী নামে একটী কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। সুলক্ষণীর গর্ভে শ্রীচন্দ্র ও লক্ষ্মীদাস নামে নানকের দুই পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীচন্দ্র উদাসীন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।

নানকের লিখিত আদিগ্রন্থে তদীয় মত সকল পরিব্যক্ত হইয়াছে। যাহাতে দেশ হইতে বাহ্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান ও জাত্যভিমানের উন্মূলন হয, এবং যাহাতে দেশীয় লোকেরা পরস্পর ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া সুপরিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও সাধুবৃত্তি অবলম্বন করে, নানক তাহার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহার মতে নানাজাতিতে ও নানা সম্প্রদাযে বিভক্ত হইয়া থাকা উচিত নহে, দেবালয়ে গিয়া যাগযজ্ঞ করা ও তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজন করানও কর্ত্তব্য নহে। ইন্দ্রিয় দমন ও চিত্ত-সংযমই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর।

আত্মশুদ্ধি নানকের মূলমন্ত্র। বিশুদ্ধ হৃদয়ে একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ করা হয। তিনি কহিতেন, ঈশ্বর এক ভিন্ন বহু নহেন, এবং প্রকৃত বিশ্বাস এক ভিন্ন নানা নহে। তবে যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে নানা প্রকার ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়, সে কেবল মনুষ্যের কল্পিত

মাত্র। ধর্ম্ম, দয়া, বীরত্ব ও সংগৃহীত জ্ঞান বস্তুতঃ কিছুই নহে; যে জ্ঞান-বলে ঈশ্বরের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহাই লাভ করিতে চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহার মতে ঈশ্বর এক, প্রভুর প্রভু ও সর্ব্বশক্তিমান্। সৎকার্য্য ও সদাচারে সেই এক, প্রভুর প্রভু, ও সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হওয়া যায়।

নানকের মতে সংসার-বিরাগ ও সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অনাবশ্যক। সাধু যোগী ও পরমাত্মনিষ্ঠ গৃহী উভয়ই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের চক্ষে তুল্য। তিনি কহিতেন, যাঁহার হৃদয় সৎ, তিনিই প্রকৃত হিন্দু এবং যাঁহার জীবন পবিত্র, তিনিই প্রকৃত মুসলমান। নানক যেরূপ পবিত্র ও উদার মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার প্রবর্ত্তিত উপাসনা-পদ্ধতি যেরূপ সকল সময়ে সকল স্থলেই অপরিবর্ত্তনীয় হইয়া রহিয়াছে, তজ্জন্য তিনি কখনও স্পর্দ্ধা বা অহঙ্কার প্রকাশ করেন নাই। তিনি আপনাকে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের একজন দাস ও বিনয়ী আদেশ-বাহক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। নিজের লিখিত ধর্ম্মানুশাসন জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ হইলেও তিনি কখনও তাহার উল্লেখ করিয়া আত্মগরিমার বিস্তারে উন্মুখ হন নাই, এবং নিজের ধর্ম্ম-প্রচারে অসাধারণ ভাবের বিকাশ থাকিলেও কখনও তাহা অমানুষী ঘটনায় কলঙ্কিত করেন নাই। তিনি কহিতেন, "ঈশ্বরের কথা ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রে যুদ্ধ করিও না। আপনাদের মতের পবিত্রতা ব্যতীত সাধু ধর্ম্ম প্রচারকগণের অন্য কোনও অবলম্বন নাই।"

গুরু নানক এইরূপে কালান্তরাগত ভ্রান্তির উচ্ছেদ করিয়া সাধারণকে উদার ও পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এইরূপে শিষ্যগণ তাঁহার নিষ্কলঙ্ক ধর্ম্মপদ্ধতির উপর স্থাপিত হইয়া ধীরে ধীরে একটী নিষ্কলঙ্ক ধর্ম্ম-পরায়ণ সম্প্রদায় হইয়া উঠে। "শিষ্য" শব্দের অপভ্রংশে "শিখ" নামের উৎপত্তি হয়। নানকের শিষ্য-

গণ অতঃপর সাধারণের নিকট এই "শিখ" নামেই পরিচিত হইয়া উঠে। কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন, শিখা হইতে "শিখ" নামের উদ্ভব হইয়াছে। যে সকল পঞ্জাব-বাসীর মস্তকে শিখা আছে, তাহারাই "শিখ"।

দুর্গাবতী।

ভারতবর্ষের মধ্যভাগে এলাহাবাদ হইতে প্রায় একশত ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে গড়মণ্ডল নামে একটী মহাপরাক্রান্ত রাজ্য ছিল। হিন্দুদিগের রাজত্বকালে সোহাগপুর, ছত্রিশগড়, সম্ভলপুর প্রভৃতি জনপদ লইয়া এই রাজ্য সংগঠিত হয়। সোহাগপুর বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত। এই স্থানের অধিকাংশ অরণ্যানীতে পরিবৃত। প্রকৃতির অনুকূলতা বশতঃ ইহা ধন-সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। প্রথিত আছে, ভোঁসলাবংশীয় নৃপতিগণ বলপূর্ব্বক সোহাগপুরের রাজস্ব গ্রহণ করিতেন। ছত্রিশগড় গোণ্ডবন প্রদেশের অন্তঃপাতী। পূর্ব্বে ইহা বহ্নপুর নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সচরাচর ছত্রিশগড় জহর খণ্ড নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই ভূভাগের কিয়দংশ অরণ্য ও পর্ব্বত-মালায় সমাকীর্ণ।

গড়মণ্ডল রাজ্য মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত। ইহার কোথাও লোকাকীর্ণ পল্লী, সুরম্য জলাশয়, কমনীয় উপবন নেত্র-তৃপ্তিকর গ্রামীনতার অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিতেছে, কোথাও প্রসন্নসলিলা তরঙ্গিণী বৃক্ষ-সমাকীর্ণ বনভূমির প্রান্ত-দেশে রজত-মালার ন্যায় পরিশোভিত হইতেছে; কোথাও নবীন লতা-সমূহে সুদৃশ্য পুষ্প ও পল্লবে সজ্জিত হইয়া বাসন্তী লক্ষ্মীর মহিমা পরিবর্দ্ধিত করিতেছে, কোথাও ভীমদর্শন পর্ব্বত স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া বিরাট পুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান

রহিয়াছে, এবং কোথাও প্রস্রবণ-সমূহ পরিষ্কৃত সলিল প্রদান করিয়া অরণ্যেচর জীবগণের তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে! গড়মণ্ডলের রাজধানী সুপ্রসিদ্ধ গড় নগর নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ-তীরে জব্বলপুরের প্রায় পাঁচ মাইল অন্তরে অবস্থিত ছিল। ইহা শৈলমালায় পরিবেষ্টিত থাকাতে শত্রুপক্ষের দুরাক্রম্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। যবন রাজগণ দিল্লীর সিংহাসন করায়ত্ত করিয়া চারিদিকে আপনাদের ক্ষমতা প্রসারিত করিতেছিলেন; ক্রমে ভারতবর্ষের অনেক রাজ্য তাঁহাদের অর্দ্ধচন্দ্র-চিহ্নিত পতাকায় শোভিত হইতেছিল; কিন্তু কখনও গড়মণ্ডলে তাঁহাদের প্রতাপ প্রবিষ্ট হয় নাই। যবন ভূপতিগণের সৈন্যসাগরের প্রবল তরঙ্গ ভীষণ প্রাকৃতিক প্রাচীর অতিক্রম করিয়া গড়রাজ্য বিধ্বস্ত করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই রাজ্যের দৈর্ঘ্য তিন শত মাইল ও বিস্তার একশত মাইল ছিল।

মোগলবংশীয় আকবর সাহ যখন দিল্লীর শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন, তখন চন্দন নামে মহবা-রাজের কন্যা পতিবিহীনা দুর্গাবতী গড় রাজ্যের অধিপত্নী ছিলেন। কথিত আছে, তৎকালে দুর্গাবতীর ন্যায় রূপ-লাবণ্যবতী মহিলা ভারতবর্ষে কেহ ছিল না। দুর্গাবতীর কেবল সৌন্দর্য্য অসাধারণ ছিল না, তাঁহার প্রকৃতিও অসাধারণ ছিল। দুর্গাবতী অবলা-হৃদয়ের অধিকারিণী হইয়াও তেজস্বিনী ছিলেন, এবং বাল্যকাল হইতে পর-বশে থাকিয়াও রাজ্য-শাসনের সমুদয় কৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনা সর্ব্বদা অপ্রতিহত থাকিত, এবং তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি সর্ব্বদা রাজ্যের মঙ্গল সম্পাদনে যত্ন প্রদর্শন করিত। লোকে রণভূমিতে তাঁহার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া যেরূপ ভীত হইত, আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিতেও কোমলতা ও মৃদুতা দেখিয়া সেইরূপ প্রীতি অনুভব করিত। দুর্গাবতী তেজস্বিতা ও কোম-

লতা উভয়েরই অবলম্বন ছিলেন, উভয়ই তাঁহার হৃদয়কে সমুন্নত ও সমলঙ্কৃত করিয়াছিল।

আকবর সাহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বহরাম নামে তাঁহার প্রধান কার্য্যসচিবের হস্ত হইতে সাম্রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণপূর্ব্বক অবাধ্য আমীর ও ভূস্বামিদিগকে শাসন করিবার জন্য নানা-স্থানে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এই সেনাপতিদিগের মধ্যে আসফ খাঁ নামে একজন উদ্ধত-স্বভাব সৈনিক-প্রধান নর্ম্মদা নদীর তটবর্ত্তী প্রদেশ শাসনার্থ প্রেরিত হন। আসফ খাঁ গড়-মণ্ডলের সমৃদ্ধির বিষয় অবগত ছিলেন, সুতরাং এই রাজ্য হস্তগত করিবার জন্য তিনি সাতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়া উঠি-লেন। আকবর সাহ স্বাধিকার সম্প্রসারিত করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না; তিনি সেনাপতিকে গড় রাজ্য অধিকার-ভুক্ত করিতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। সম্রাটের আদেশ ও উৎসাহে সাহসী হইয়া ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আসফ ছয় সহস্র অশ্বারোহী ও দ্বাদশ সহস্র পদাতি সমভিব্যাহারে গড়মণ্ডল আক্রমণার্থ যাত্রা করিলেন।

অবিলম্বে এই অভিযান-বার্ত্তা গড়রাজ্যে ঘোষিত হইল। রাজ্যের বালক, বৃদ্ধ, বনিতা সকলেই এই আকস্মিক আক্রমণ সংবাদে যার পর নাই ভীত হইয়া উঠিল। কিন্তু তেজস্বিনী দুর্গাবতীর হৃদয়ে কিছুমাত্র ভীতির সঞ্চার বা কর্ত্তব্য-বিমুখতার আভাস লক্ষিত হইল না; তিনি অকুতোভয়ে, প্রগাঢ় সাহস সহকারে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ সমর-সংক্রান্ত সভা সংগঠিত হইল, সৈন্যগণ যুদ্ধাভরণে সমলঙ্কৃত ও রণমদে উন্মত্ত হইয়া সমবেত হইতে লাগিল, রণপণ্ডিত সেনা-পতিগণ একে একে আসিয়া অধিনায়কতা গ্রহণ করিতে লাগি-লেন; অল্পসময়ের মধ্যেই গড়রাজ্যে বিশাল সৈন্য-সাগরের

আবির্ভাব হইল। দুর্গাবতীর বীরবল্লভ নামে অষ্টাদশবর্ষ-বয়স্ক একটী পুত্র-সন্তান ছিল, এই যুবকও অমিতবিক্রমে আসিয়া যুদ্ধ-যাত্রীর দলে সম্মিলিত হইলেন। দুর্গাবতী এই সৈন্য-সমষ্টির শৃঙ্খলা বিধান করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন নাই। তিনি স্বয়ং যুদ্ধ বেশে সজ্জিত হইয়া শিরোদেশে রাজ-মুকুট, এক হস্তে শাণিত শূল ও অপর হস্তে ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক গজপৃষ্ঠে আরোহণ করি-লেন। কামিনীর কোমল হৃদয় এক্ষণে স্বদেশের স্বাধীনতা, স্ববংশের সম্মানরক্ষার্থ অটলতা ও অনমনীয়তার আস্পদ হইল। দুর্গাবতী হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গম্ভীরোন্নতস্বরে স্বীয় সৈন্য-দিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—"তোমাদের প্রতি অদ্য একটী মহৎ কর্ত্তব্য-ভার সমর্পিত হইতেছে, আমি আশা করি, তোমরা কখনও এই কর্ত্তব্য সম্পাদনে উদাসীন হইবে না। জীবন চিরস্থায়ি নহে, পার্থিব সুখ চিরস্থায়ি নহে, এবং ভোগলালসাও চিরস্থায়িনী নহে। অদ্য যে জীবন স্রোতঃ খরতর বেগে প্রধাবিত হইতেছে, হয়ত কল্যই তাহা অনন্ত সাগরে বিলীন হইবে, অদ্য যে পার্থিব সুখ দেহের প্রতি-গ্রন্থি অমৃতরসে অভিষিক্ত করিতেছে, হয়ত কল্যই তাহা দুঃখের ভয়াবহ আক্রমণে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, এবং অদ্য যে ভোগ-লালসা উদ্দাম মানবী প্রকৃতিকে দ্বিগুণ উৎসাহান্বিত করিয়া তুলিতেছে, হয়ত কল্যই তাহা নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হইয়া হৃদয়ের প্রতিস্তরে নিদারুণ তুষানলের সঞ্চার করিবে। ঈদৃশ ক্ষণ-ভঙ্গুর, ক্ষণস্থিতি-শীল বিষয়ের মমতায় আকৃষ্ট হইয়া অনন্ত সুখে জলাঞ্জলি দেওয়া বিধেয় নহে। স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ কর, প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিয়া বিদেশী, বিধর্ম্মী শত্রুকে স্বদেশ হইতে দূরীভূত করিতে সমুদ্যত হও। তোমাদের করস্থিত শাণিত অসি শত্রুর দেহ দ্বিখণ্ড করুক, তোমাদের অধিষ্ঠিত

তেজস্বী তুরঙ্গম শত্রুর অনন্তপ্রবাহ শোণিত-স্রোতে সন্তরণ করুক, তোমাদের পরাক্রম ও তোমাদের রণপারদর্শিতা বিজয়-পতাকায় জন্মভূমি শোভিত করুক। এই মহৎ কার্য্য সাধন করিতে যাইয়া মৃত্যুকে ভয় করিও না, সমরের সংহার-মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত বা কর্ত্তব্য-বিমুখ হইও না। সাহস, উদ্যম ও পরাক্রমের সহিত সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, পরলোকে অনন্ত সুখের অধিকারী হইবে।" বীর-জায়ার এই তেজস্বিবাক্যে উৎসাহান্বিত হইয়া, গড়মণ্ডলের সৈন্যগণ "হর হর" ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া যুদ্ধার্থ যাত্রা করিল, তেজস্বিনী দুর্গাবতী এই উৎসাহান্বিত সৈন্যদলের পরিচালন-ভার গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রুসেনা বিধ্বস্ত করিতে যাইতে লাগিলেন।

দুর্গাবতী যখন অষ্ট সহস্র অশ্ব, সার্দ্ধেক সহস্র হস্তী ও সৈন্যদল সমভিব্যাহারে শত্রুগণের সম্মুখীন হইলেন, তখন তাঁহার তদানীন্তন ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দর্শনে যবন-সৈন্য সন্ত্রস্ত হইল এবং তাহাদের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভীতি সঞ্চারিত হইয়া স্বকার্য্যসাধনে বাধা দিতে লাগিল। দুর্গাবতী প্রবল পরাক্রমের সহিত দুইবার আসফ খাঁর সৈন্যদল আক্রমণ করিলেন, দুইবারই তাঁহার জয়লাভ হইল। যবন-সৈন্য রাণীর সেনাগণের অমিত বিক্রমে ক্ষণকাল মধ্যেই বিধ্বস্ত-প্রায় হইয়া পড়িল, তাহাদের ছয়শত অশ্বারোহীর দেহরত্ন সমরাঙ্গণে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল, শেষে শত্রুগণ রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন-পর হইল। দুর্গাবতী দ্বিতীয়বার শত্রুসেনার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। এইরূপে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। পরিশেষে সূর্য্য অস্তাচলশায়ী হইল দেখিয়া তিনি স্বীয় সৈন্যদিগকে বিশ্রাম করিতে অনুমতি দিলেন।

কিন্তু এই বিশ্রাম-সুখই তেজস্বিনী দুর্গাবতীর পক্ষে মহা

অমঙ্গলের নিদান হইয়া উঠিল। গড়মণ্ডল-বাসী সৈন্যগণ সেই সময়ে, সমস্ত রাত্রি বিশ্রাম করিবার জন্য লালায়িত হওয়াতে দুর্গাবতী সাতিশয় ম্রিয়মাণ হইলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর সেই রাত্রিতেই মুসলমান সেনা-নিবাস আক্রমণ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তাঁহার এই অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত হইলে আসফ খাঁর সৈন্যগণ নিঃসন্দেহ নির্ম্মূল হইত। কিন্তু বীর্য্যবতী বীর-জায়ার এই ইচ্ছা ফলবতী হইল না, সৈন্যগণের সকলেই ঈদৃশ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রদর্শন করিল, এবং সকলেই তাঁহাকে বিনয় সহকারে নিশীথে যবন-সৈন্য আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে নিষেধ করিতে লাগিল। দুর্গাবতী এই প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। এদিকে আসফ খাঁ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, দুইবার যুদ্ধে পরাজিত হওয়াতে তিনি সাতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে গড়মণ্ডলের সৈন্যগণের প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদে তিনি সাতিশয় হর্ষোৎফুল্ল হইয়া কামান ও সৈন্যদল লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন। প্রভাত না হইতে হইতেই তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলেন। গড়মণ্ডলবাসী সৈনিকগণ শান্তি-প্রদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে শান্তি-সুখ অনুভব করিতেছিল, আসফ খাঁ সেই সুযোগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। অবিলম্বে দুর্গাবতীর সৈন্যগণ জাগরিত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিল, দুর্গাবতী এই আকস্মিক আক্রমণেও কিছুমাত্র ভীত বা কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন না। তিনি আপনার সৈন্যদিগকে একত্রিত করিয়া একটী সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট আশ্রয়পূর্ব্বক শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু অবিচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণে সে স্থানে অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলেন না, সঙ্কীর্ণ পথ পরি-ত্যাগপূর্ব্বক একটী সুপ্রশস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া শত্রুপক্ষের আক্রমণ নিরস্ত করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন।

এই প্রশস্ত সমরস্থলে উপস্থিত হইয়া কুমার বীরবল্লভ অসাধারণ বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অষ্টাদশ বর্ষ-বয়স্ক তরুণ বীর পুরুষের এই লোকাতীত পরাক্রম দর্শনে যবন-সৈন্য স্তম্ভিত-প্রায় হইল। কিন্তু শেষে বহুসংখ্য যবনের আক্রমণে বীরবল্লভ আহত হইয়া অশ্ব হইতে পতনোন্মুখ হইলেন। দুর্গাবতী প্রাণাধিক পুত্রের কাতরতা দর্শনে যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন না, প্রত্যুত পুত্রকে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ দিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিক্রমে রণ-কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দুর্গাবতীর অধিকাংশ সৈন্য বীর-শয্যায় শয়ন করিয়াছিল, অধিকাংশ সৈন্যের দেহরাশিতে সমরস্থল ভীষণতর হইয়া উঠিয়াছিল, চারিদিকে যবন সৈন্য উদ্বেল সমুদ্রের ন্যায় বিশ্বত্রাস গর্জ্জনে ক্রমে তাঁহার সম্মুখীন হইতেছিল, দুর্গাবতী কেবল তিন শত মাত্র পদাতি লইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। এমন সময়ে শত্রুনিক্ষিপ্ত একটী সুতীক্ষ্ণ শায়ক হঠাৎ তাঁহার এক চক্ষে বিদ্ধ হইল। দুর্গাবতী এই বাণ বলপূর্ব্বক নেত্র হইতে নিঃসারিত করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। শর নিঃসারিত না হইয়া চক্ষু-কোটরেই বিদ্ধ হইয়া রহিল। ইহার পর আর একটী তীর প্রবলবেগে তাঁহার গ্রীবাদেশে আসিয়া পতিত হইল; দুর্গাবতী এইরূপে পুনঃ পুনঃ শরাহত হইয়া কাতর হইলেন, চারিদিক তাঁহার নিকট অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ হইতে লাগিল, তখন তিনি জয়াশায় জলাঞ্জলি দিলেন। যে অভিপ্রায়ে তিনি সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যে অভিপ্রায় লক্ষ্য করিয়া অমিত বিক্রমে যবন সৈন্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, যে অভিপ্রায় অনুসারে সমর ক্ষেত্রে প্রাণপ্রিয় পুত্র-সন্তানের শোচনীয় দশাও অকাতরভাবে চাহিয়া দেখিয়াছিলেন, সে অভিপ্রায়সিদ্ধির আর কোনও সম্ভাবনা রহিল না। কিন্তু দুর্গাবতী

ঈদৃশী অবস্থাতেও ভীরুর ন্যায় সমর-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন না, ভীরুর ন্যায় বীরধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া শত্রুর পদানত হইলেন না। বীরাঙ্গণা বীর-ধর্ম্ম রক্ষার্থে সমর ক্ষেত্রেই দেহপাত করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। যখন আহত স্থান হইতে শোণিত-ধারা অনর্গলভাবে প্রবাহিত হইয়া তাঁহার দেহ প্লাবিত করিল, শরীর স্তম্ভিত হইয়া আসিল, শারীরিক তেজ ক্ষীণতর হইয়া পড়িল, তখন তিনি অম্লান বদনে ও ধীরভাবে সমীপবর্ত্তী একজন কর্ম্মচারীর হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ করবাল গ্রহণ করিলেন, এবং অম্লানবদনে ও ধীরভাবে উহা স্বীয় দেহে প্রবেশিত করিয়া রুধিরে রঞ্জিত করিয়া ফেলিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার লাবণ্যলীলা-ভূমি কমনীয় দেহ শব-সমাকীর্ণ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ছয়জন সৈনিক পুরুষ দুর্গা-বতীর সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা এই অসম সাহসি-কতার কার্য্য দর্শনে জীবনাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক তীব্রবেগে শত্রু-দল মধ্যে প্রবেশ করিল এবং বহুসংখ্য যবন-সৈন্য মৃত্যুমুখে পাতিত করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য অনন্ত নিদ্রায় অভি-ভূত হইল।

যে স্থানে দুর্গাবতী প্রাণ পরিত্যাগ করেন, পর্য্যটকগণ অদ্যাপি পথ অতিবাহন সময়ে সেই স্থল নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহা একটী সঙ্কীর্ণ গিরি-সঙ্কট। ইহার নিকটে দুটী অতি প্রকাণ্ড বৃত্তাকার প্রস্তর রহিয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস, দুর্গাবতীর রণ-দুন্দুভিদ্বয় এক্ষণে প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে। রাত্রি শেষে সমীপ-বর্ত্তী অরণ্য-প্রদেশ হইতে এই দুন্দুভি-ধ্বনি শ্রুতি প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। যাহাহউক, এই গিরিসঙ্কট একটী প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত সংসৃষ্ট হওয়াতে দর্শনীয় স্থানের মধ্যে পরি-গণিত হইয়াছে। এই গম্ভীর স্থানের গম্ভীর দৃশ্য অবলোকন

করিলে মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। যবন সেনাগণ গড় নগর বিলুণ্ঠন করিয়া অনেক অর্থ পাইয়াছিল। আসফ খাঁ বিশ্বাসঘাতক হইয়া অনেক সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন, কথিত আছে তিনি দুর্গাবতীর ধনাগারে এক শতটী স্বর্ণ মুদ্রা-পরিপূর্ণ কলস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অদ্যাপি সুতগণ দুর্গাবতীর অক্ষয় কীর্ত্তি-কাহিনী গীতিকায় নিবদ্ধ করিয়া সুমধুর বীণা সংযোগে নানা স্থানে গান করিয়া বেড়ায়। কালের কঠোর আক্রমণে গড় রাজ্য এক্ষণে পূর্ব্বগৌরবভ্রষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু তেজস্বিনী দুর্গাবতীর গৌরব কখনও বিলুপ্ত হইবার নহে। যত দিন স্বাধীনতার সম্মান বর্ত্তমান রহিবে, যত দিন অতুলনীয় বীরত্ব অদীনপরাক্রম বীরেন্দ্র-সমাজের এক মাত্র সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে, যতদিন "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই পবিত্র ও মধুর বাক্য স্বদেশ-বৎসল ব্যক্তির কোমল হৃদয় অচিন্ত্যপূর্ব্ব অমৃত-প্রবাহে অভিষিক্ত করিবে, এবং যত দিন আত্মাদর ও আত্ম-সম্মান পাপ ও কুপ্রবৃত্তির মোহিনী মায়ায় বিমুগ্ধ না হইয়া গগনস্পর্শী গিরিবরের ন্যায় সমুন্নত থাকিবে, ততদিন দুর্গাবতীর অনন্ত কীর্ত্তি-কাহিনী স্বদেশ হিতৈষী কবির রসময়ী কবিতায় এবং অপক্ষপাত ঐতিহাসিকের সারল্যময়ী বর্ণনায় বিঘোষিত হইবে, ততদিন দুর্গাবতীর অনন্ত কীর্ত্তি-স্তম্ভ মেদিনীমণ্ডলে জাজ্বল্যমান রহিবে। হিমালয়ের অযুত শৃঙ্গপাতেও ইহা বিচূর্ণ হইবে না, এবং ভারত-মহাসাগরের সমগ্র বারিতেও ইহা বিলুপ্ত হইবে না।

বড়বাগ্নি।

বিজ্ঞানেব গবীযসী শক্তিব প্রভাবে প্রতিদিন যে কত শত নিগূঢ় তত্ত্বেব আবিষ্কাব হইতেছে, তাহাব ইযত্তা করা যায না। পূর্ব্বে যাহা কেবল কল্পনা-সম্ভূত বলিযা বোধ ছিল, এক্ষণে তাহা বিজ্ঞানের প্রসাদে প্রত্যক্ষীভূত প্রাকৃতিক পদার্থ বলিযা পবিগণিত হইতেছে, এস্থলে যে অগ্নির বিষয বিবৃত হইতেছে, তাহাতেও এইরূপ কল্পনা ও বিজ্ঞানের চাতুর্য্য লক্ষিত হইবে।

বাবি-বাশির মধ্যে যে অগ্নি উদ্দীপ্ত হয, ইহা আমাদের দেশের অনেকেই অবগত আছেন। এই অগ্নি বড়বাগ্নি অথবা বডবানল নামে প্রসিদ্ধ। মহাভাবতে এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী উপন্যাস বর্ণিত আছে। মহাবাজ কৃতবীর্য্যেব বংশীয বাজগণ প্রযোজন বশতঃ অতি সমৃদ্ধিশালী ভৃগু-বংশীযেব নিকট অর্থ প্রার্থনা করাতে ভার্গবেরা সেই প্রার্থনা অগ্রাহ্য কবেন। এতন্নিবন্ধন ক্ষত্রিয বাজাবা অমর্ষ-প্রদীপ্ত হইযা ভার্গব দিগকে বিনষ্ট করেন। ভৃগু-বংশীয মহিলাগণ এই আকস্মিক বিপদে ভীত হইযা হিমালয পর্ব্বতে যাইযা লুক্কাযিত হন। ইঁহা-দেব অন্যতমা মহিলার ঔর্ব্ব্য নামে একটী পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয। ঔর্ব্ব্য ঋষি ক্ষত্রিযদিগেব অত্যাচাব ও স্ববংশীযেব সংহাব-বার্ত্তা শ্রবণ পুর্ব্বক ক্রোধে অধীর হইযা সর্ব্বলোক ধ্বংস কবিবার জন্য কঠোর তপস্যায প্রবৃত্ত হন, কিন্তু পিতৃলোক এই সংহার-কার্য্যের অনুষ্ঠান কবিতে নিষেধ করাতে ঔর্ব্ব্য তাঁহাদেব আদেশক্রমে স্বীয ক্রোধজ বহ্নি সমুদ্রে নিক্ষেপ কবেন। ইহাতে হঠাৎ একটী বৃহদাকার অশ্বের মস্তক উৎপন্ন হয, এবং সেই অশ্ব-মুখ হইতে ঔর্ব্ব্য-প্রক্ষিপ্ত বহ্নি নির্গত হইয়া সমুদ্রের জল শোষণ

করিতে আরম্ভ করে। বড়বার (ঘোটকীর) মুখ হইতে নিঃসৃত হওয়াতে এই বহ্নি বড়বাগ্নি অথবা বড়বানল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই আখ্যায়িকার সহিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কোনও সংস্রব নাই। ইহা পূর্ব্বতন ভারতীয় ঋষির কল্পনা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে এই বড়বাগ্নির সম্বন্ধে অনেক মত-ভেদ দৃষ্ট হয়। মেয়ার নামে একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা এতৎ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, প্রখর আতপ-তপ্ত হীরক প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থ যে কারণে অন্ধকারময় গৃহে অগ্নিকণা বিকীরণ করে, সেই কারণে সাগরের বারি-রাশি হইতেও পাবকশিখা উদ্গত হইয়া থাকে। দিবাভাগে সমুদ্রের জল অবিরত সূর্য্য-কিরণ আকর্ষণ করে, রাত্রিকালে এই আকৃষ্ট কিরণ পাবক শিখারূপে প্রতিভাত হইয়া উঠে। অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের মতে সমুদ্রের জল ফস্‌ফরস্‌ নামে রাসায়নিক বস্তু-বিশেষের ধর্ম্ম-বিশিষ্ট, এজন্য বায়ুসংযোগে তাহা হইতে আলোক-শিখা নির্গত হয়। অন্য এক সম্প্রদায় নির্দ্দেশ করেন, বিভিন্ন তড়িদ্‌বিশিষ্ট মেঘখণ্ড-দ্বয়ের সংঘাতে যেরূপ তড়িল্লতার উৎপত্তি হয়, সাগরের ঊর্ম্মিমালার সংঘর্ষণেও সেইরূপ তাড়িতপ্রবাহ নিঃসৃত হইয়া থাকে, এই তড়িৎ-প্রবাহ বড়বানল নামে প্রসিদ্ধ। এই তড়িৎ সমুদ্রের সলিলরাশিতে নিয়ত অবস্থিতি করে, না অন্য কোন স্থান হইতে সমাগত হয়, পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ তাহার কোন মীমাংসা করেন নাই। কিন্তু এই সকল বৈজ্ঞানিকের মতের প্রতি এক্ষণে কাহারও কিছু-মাত্র শ্রদ্ধা দেখা যায় না। এগুলি ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণা কেবল সৈন্ধব সলিলেই নিবদ্ধ থাকে নাই। এই বিজ্ঞানবিদ্‌গণ সামুদ্রিক কীট বিশেষ

পরীক্ষা করিয়া বড়বানলের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়াছেন। বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার মেক্কালক্ বারম্বার পরীক্ষা করিয়া স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, সমুদ্র-সলিলে যে সকল প্রাণী বাস করে, তাহাদের গলিত শব হইতে বড়বাগ্নির উৎপত্তি হইয়া থাকে। সমুদ্রের জল সাধারণতঃ নীলবর্ণ, কর্দ্দম, শৈবাল ও কীটাণু প্রভৃতির সংযোগে সময়ে সময়ে উহা শুভ্র ও হরিদ্বর্ণ হইয়া থাকে। শুভ্র ও হরিদ্বর্ণ জল-রাশিতে বড়-বাগ্নির আধিক্য দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু সাগর-বারি যতই দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ হয়, বড়বাগ্নি ততই চারিদিকে প্রসারিত হইয়া উঠে।

কিন্তু কেবল সামুদ্রিক মৃত জীবের দেহ হইতে এই আলোকের উদ্ভব হয় না, সময়ে সময়ে সজীব প্রাণীর শরীর হইতেও ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। ডাক্তার বুকানন ইহার একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আমরা একদা অর্ণবযান আরোহণে ভারত মহাসাগরের উত্তরাংশে যাইতে যাইতে দেখিলাম, বারি-রাশি অপূর্ব্ব শ্বেতবর্ণ হইয়াছে। আকাশ পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল নীলাভ, কেবল অদূরে কিয়দংশ কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হইতেছিল। সায়ংকাল হইতে রাত্রি আট ঘটিকা পর্য্যন্ত সাগর-সলিলের শুভ্রতা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, আটটা হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত উহা এরূপ সুপরিস্ফুত শ্বেতবর্ণ হইয়া উঠিল যে, সাগর-তলের সহিত ছায়াপথের তুলনা করা অসঙ্গত বোধ হইল না। অধিকন্তু ছায়াপথে যেমন সমুজ্জ্বল তারকা দৃষ্ট হয়, সমুদ্রের দুগ্ধবর্ণ বারি-রাশিতেও সেইরূপ অনলকণা দৃষ্টি-পথবর্ত্তী হইল। রাত্রি দুই প্রহরের পর হইতে এই আলোক-শিখা ক্রমে হ্রস্ব হইতে লাগিল, পরে উষাকালে ইহা একবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। এই কিরণ-জালে অর্ণব-

পোতের উপরিভাগ এরূপ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, পোতস্থ দ্রব্যাদি সুস্পষ্ট নয়নগোচর হইয়াছিল।"

বুকানন এই বিস্ময়কর ব্যাপারের কারণ নির্ণয়ার্থ সেই সমুদ্রের কয়েক পাত্র জল উত্তোলন করিয়া পরীক্ষা করেন। তাহাতে জল-মধ্যে যবোদরের এক ষোড়শাংশ-পরিমিত কতকগুলি দীপ্তিশীল কীটাণু দৃষ্ট হয়। সাধারণ কীটাণু সকল জলে যে ভাবে সন্তরণ করে, এগুলিও সেই ভাবে বেড়াইতে ছিল। বুকানন কয়েকটী কীটাণু অঙ্গুলির অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া দেখেন, তাহা হইতে আলোক-শিখা নির্গত হইতেছে। উহা প্রদীপের নিকট ধরাতে ঐ আলোক অন্তর্হিত হইয়া গেল। সাড়ে তিন সের জলে প্রায় চারি শত কীটাণু দৃষ্ট হইয়াছিল, অথচ উহাতে জলের স্বাভাবিক বর্ণের কোনও ব্যত্যয় নাই। বেনেট্ নামে একজন-সমুদ্র-যাত্রীর লিখিত বিবরণ মধ্যেও ঐরূপ সৈন্ধব আলোকের বিষয় পরিদৃষ্ট হয়। ইনি লিখিয়াছেন, "আমি একদা হরণ অন্তরীপের নিকটে রাত্রিকালে পোতারোহণে বিচরণ করিতে ছিলাম, বায়ু নিস্তব্ধ ও চারিদিক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। হঠাৎ দেখিলাম, সাগর-গর্ভ হইতে আলোক-শিখা সমূহ অন্ধকার ভেদ করিয়া উত্থিত হইতেছে। নির্ব্বাত সাগরের জল-রাশি নিশ্চল থাকাতে এই আলোক প্রথমে ক্ষীণ-প্রভ ছিল, কিন্তু পোতের গতি নিবন্ধন জল তরঙ্গায়িত হওয়াতে এই বহ্নি-শিখা এরূপ দীপ্তিশালিনী হইল যে, সমস্ত অর্ণবযান আলোকমালায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। যানের এক পার্শ্বে এক খানি জাল আকর্ষণ করাতে বোধ হইল যেন ধূমকেতুর ন্যায় পুচ্ছবিশিষ্ট একটী অগ্নি-পিণ্ড সবেগে গমন করিতেছে। মৎস্য-সমূহের উল্লম্ফনে বোধ হইল, তরঙ্গায়িত সাগর-বারিতে সমুজ্জ্বল বহ্নিরেখা অঙ্কিত হইতেছে।

বেনেট সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এক প্রকার চাঁদা মৎস্য হইতে এই আলোক-শিখা নির্গত হইয়াছিল, এই মৎস্যের আকার গোল, বর্ণ তরলপীত এবং পরিধি প্রায় আট ইঞ্চি। ইহার দেহের পূর্ব্বার্দ্ধ ভাগের এক পার্শ্বে এক খণ্ড অধি-মাংস আছে, এবং কণ্টক-বিশিষ্ট পক্ষ এই অধিমাংসের সহিত সংযোজিত রহিয়াছে। উত্তেজিত হইলেই মৎস্য-সমূহ সকণ্টক পক্ষ-বিশিষ্ট অধিমাংস ঘন ঘন কম্পিত করে, এই কম্পনে উহা হইতে আলোক নির্গত হয়। মৎস্য যতই প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করে, আলোক-শিখা ততই মন্দীভূত হইতে থাকে। অধিকন্তু এই মৎস্যের শরীরে নির্যাসবৎ এক প্রকার পদার্থ আছে, উহা জলের সহিত মিশ্রিত হইলেও আলোকের উৎপত্তি হয়। বেনেট এই জাতীয় কয়েকটী মৎস্য পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া দেখি-য়াছেন যে, ঐ জলের আলোক-বিকীরণ শক্তি জন্মিয়াছে। বেনেটের পরীক্ষা-বলে এই চাঁদা মৎস্য ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার আলোক-প্রদ ক্ষুদ্র মৎস্য সাধারণের পরিজ্ঞাত হইয়াছে। এই সকল মৎস্যের দেহের সাধারণ বর্ণ ইস্পাতের বর্ণের ন্যায়; কেবল শল্ক ও পক্ষ পাংশুবর্ণ, দেহের নিম্নভাগে একশ্রেণী অনতি-গভীর রন্ধ্র আছে। এই মৎস্য জলপূর্ণ পাত্রে ছাড়িয়া দিলে মহোল্লাসে সন্তরণ করিতে লাগিল, উহার দেহ-স্থিত রন্ধ্র-সমূহ হইতে নক্ষত্র-জ্যোতির ন্যায় কখন স্তিমিত, কখন দীপ্তিশীল আলোক নিঃসৃত হইল। ইহার পর ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করাতে যখন উহা সমুত্তেজিত হইয়া সবেগে সন্তরণ করিতে লাগিল, তখন কেবল পূর্ব্বোক্ত রন্ধ্র সমূহ হইতে আলোক বিকীর্ণ হইল না, প্রত্যুত দেহের সমস্ত অংশ হইতেই উজ্জ্বল বহ্নি-শিখা নির্গত হইয়া জল আলোকিত করিয়া তুলিল, মৎস্য গতাসু হইলে বহ্নি-শিখা একবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

এইরূপে ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণা-বলে স্থির হইয়াছে যে, জীবিত ও মৃত মৎস্যের দেহ হইতে এবং মৎস্যের দেহ-নিঃসৃত নির্যাসবৎ পদার্থ বিশেষ জলে মিশ্রিত হওযাতে বড়বাগ্নির উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই অগ্নি সকল সময়ে সমান রূপ পরিদৃষ্ট হয না। কখন ইহা তড়িল্লতার ন্যায় চঞ্চল, কখন বা অনতিপরিস্ফুট নিষ্কম্প দীপ-শিখার ন্যায় হীনপ্রভ দেখা যায়। সময়ে সমযে এই অগ্নি সাগরের বিশাল দেহে পরিব্যাপ্ত হইয়া চারিদিক আলোকিত করে; সময়ে সময়ে বা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ-পটলের ন্যায় উত্থিত হইয়া, কখন স্তিমিত, কখন উজ্জ্বল, কখন বা নির্ব্বাপিত হইতে থাকে। এই অগ্নি সাধা-রণ অগ্নির তুল্যবর্ণ নহে। ইহা ঈষৎ নীলাভ ও তরল পীতবর্ণ। গন্ধকোৎপন্ন বহ্নিশিখার সহিত ইহার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সমুদ্রচারিগণ বহুদূর হইতে এই অগ্নি দেখিতে পায়। প্রবল বায়ুপ্রবাহে জলধিতল সমুন্নত তরঙ্গমালায় আচ্ছন্ন হইলে ইহা অগ্নিময় গিরিশৃঙ্গের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

স্ত্রীসেনা।

স্বাধীন রাজ্য-সমূহে সৈন্যগণ যেরূপ নানা দলে বিভক্ত থাকে, শ্যাম দেশের সেনা সকলও সেইরূপ নানা সম্প্রদায়ে নিবদ্ধ আছে। তন্মধ্যে একতম সম্প্রদায় কেবল স্ত্রীজাতিতে সংগঠিত হইয়া থাকে। এই স্ত্রী সৈনিক দলের সংখ্যা চারি-শতের অধিক নহে। অন্যান্য সেনাগণ অপেক্ষা স্ত্রীসেনাগণ রাজ্য মধ্যে সমধিক আদৃত হন, ইহাঁরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেতন গ্রহণ করেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া থাকেন। সৎকুলোদ্ভব রূপযৌবনসম্পন্ন ত্রয়োদশবর্ষীয় কামিনীগণ এই সৈনিক দলে প্রবেশ করেন। পঞ্চবিংশতি বর্ষ-কাল ইহাঁদিগকে সৈনিক কার্য্যে নিযোজিত থাকিতে হয়। রাজ-দেহ, রাজ-উদ্যান ও রাজ-অট্টালিকা প্রভৃতি রক্ষা করাই ইহাঁদের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

এই স্ত্রীসেনাগণের সকলেই অবিবাহিতা থাকিতে প্রতিশ্রুত হন। কেবল রাজার সম্মতি হইলেই ইহাঁরা এই প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করিতে পারেন। এই দলস্থ পদাতিক সেনা সাতিশয় সাহস-সম্পন্না এবং যুদ্ধ বিদ্যায় অতীব পারদর্শিনী। ইহাঁরা সুবর্ণ-খচিত শুক্লবর্ণ বনাত-নির্ম্মিত এক প্রকার অঙ্গাচ্ছাদন পরিধান করিয়া তদুপরি সুবর্ণ মণ্ডিত লৌহময় বর্ম্ম ধারণ করেন। উক্ত বনাত-নির্ম্মিত অঙ্গাচ্ছাদন আজানুলম্বিত থাকে। এক প্রকার ধাতু নির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ এই সৈনিকদিগের প্রধান শিরোভূষণ, বল্লম ইহাদের প্রধান অস্ত্র; এতদ্ব্যতীত বন্দুক ও অসি প্রভৃতির প্রয়োগেও ইহাঁরা সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

প্রস্তাবিত স্ত্রীসেনাগণ চারি দলে বিভক্ত। প্রতি দলের এক এক জন কর্ত্রী থাকেন। সর্ব্বোপরি এক জন প্রধান অধিনায়িকা আছেন। চারি দলের সৈনিকদিগকেই তাঁহার শাসনাধীনে থাকিতে হয়। এই প্রধান অধিনায়িকার পদ শূন্য হইলে দেশাধিপতি উপর্য্যুপরি তিন দিন দলস্থ সমস্ত সেনার অস্ত্রচালন ও রণ-পাণ্ডিত্যের পরীক্ষা করিয়া যাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা জ্ঞান করেন, তাঁহাকেই ঐ পদে নিয়োজিত করিয়া থাকেন। কতিপয় বৎসর হইল, এই স্ত্রীসৈনিক-দলের এক জনে মৃগয়া-সময়ে রাজাকে ব্যাঘ্রহস্ত হইতে রক্ষা করিয়া ছিলেন বলিয়া সর্ব্ব প্রধান অধিনায়িকার পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সৈনিক-প্রধানার পরিচর্য্যার নিমিত্ত দশটী সুসজ্জিত হস্তী নিযুক্ত থাকে। শ্যাম দেশাধিপতির পুত্র ও কন্যাগণ যেরূপ সম্মান প্রাপ্ত হন, যেরূপ শ্রদ্ধা ও প্রীতির অধিকারী হইয়া সুখে কালাতিপাত করেন, সর্ব্ব প্রধান অধিনায়িকাও রাজ্য মধ্যে সেইরূপ সম্মান প্রাপ্ত হন, এবং সেইরূপ আদর ও প্রীতির অধিকারিণী হইয়া পরম সুখে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন। এ অংশে রাজপরিবারের সহিত তাঁহার কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। অপরাপর সৈনিকগণের প্রত্যেকের শুশ্রূষার জন্য পাঁচ জন কাফ্রি-ললনা নিয়োজিত আছে।

প্রস্তাবিত সেনাগণ প্রতি সপ্তাহে দুই দিন এক প্রশস্ত সমর-ক্ষেত্রে সমবেত হইয়া অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করেন। রাজা এই শিক্ষাকার্য্যের তত্ত্বাবধারণার্থ প্রতিমাসে একবার সেই শিক্ষা-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সকলের অস্ত্র-চালনা-কৌশল পরিদর্শন করিয়া থাকেন, যাঁহারা অস্ত্র প্রয়োগে সমধিক নৈপুণ্য ও সামরিক কার্য্যে সমধিক পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে পারিতোষিক স্বরূপ স্বর্ণময় বলয় কঙ্কণাদি প্রদত্ত

হইয়া থাকে। ইঁহাদের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হইলে ইঁহারা প্রধানার অনুমতি লইয়া সমর-ক্ষেত্রে আগমন পূর্ব্বক পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, এই যুদ্ধে এক এক জনের প্রাণ বিনষ্টও হইয়া থাকে। কিন্তু এই রমণীগণ এরূপ শুদ্ধাচারিণী, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও রণনৈপুণ্যের সহিত এরূপ চরিত্র-গুণ ইহাঁদিগকে সমলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে যে, ইঁহারা প্রায়ই কলহকারিণী অথবা কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধিনী বলিয়া অভিযুক্ত হন না। ঘটনা-ক্রমে কেহ কোন সামান্য অপরাধ করিলে তাঁহাকে তিন মাসের জন্য পদচ্যুত রাখাই সাধারণ দণ্ডের মধ্যে পরিগণিত। ইহা অপেক্ষা আর কখনও কোন গুরুতর দণ্ড বিধানের আবশ্যকতা উপস্থিত হয় না।

এইরূপে শ্যামদেশের বীর্য্যবতী ও রণপারদর্শিনী রমণীগণ কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, সদাচার ও সামরিক কার্য্য-নৈপুণ্যে রাজ্য মধ্যে সম্মান, আদর ও প্রীতির পাত্রী হইয়া মহতী দেবতা স্বরূপ রাজার শরীর রক্ষা পূর্ব্বক অক্ষয় পুণ্য ও কীর্ত্তি সঞ্চয় করেন। সাময়িক ঘটনাবলী ইহাদের গুণোৎকীর্ত্তনে কাতর হয় না, এবং সহৃদয় ঐতিহাসিকের তেজস্বিনী লেখনীও ইহাদের নিষ্কলঙ্ক যশোরাশিকে সমুজ্জ্বল করিতে ঔদাসীন্য অবলম্বন করে না।

অদ্ভুত সামুদ্রিক জীব।

সমুদ্র মধ্যে যে কত প্রকার আশ্চর্য্য জীবের বাস আছে, তাহা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ অদ্যাপি সূক্ষ্মরূপে নির্ণয় করিতে পারেন নাই। বিশাল সাগরের গর্ভে অনন্ত জীব-সমষ্টি অবস্থিতি করিতেছে। সমুদ্রযাত্রিগণ এক এক সময়ে এই প্রাণিগণের শ্রেণীবিশেষ সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এক এক সময়ে অভূতপূর্ব্ব ভয়ে বিমূর্চ্ছ-প্রায় হইয়াছেন। ইঁহারা লোকের হৃদয় আকর্ষণ করিবার জন্য এই সকল জীবের বর্ণনা কল্পনায় অতিরঞ্জিত করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। এই সকল অতিশয়োক্তিতে কাহারও বিশ্বাস বা আস্থা জন্মিতে পারে না। যাহাহউক সমুদ্রগর্ভ যে অনেক অদ্ভুত প্রাণির আবাস স্থল, তদ্বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। এস্থলে কয়েকটী অদ্ভুত সামুদ্রিক জীবের বিষয় বর্ণনা করা যাইতেছে।

কাপ্তেন উইডেল নামে একজন বিখ্যাত ভূগোলবিৎ এসম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে একটী অদ্ভুত সমুদ্র-জীবের বিষয় দৃষ্ট হয়। এই বিবরণের স্থল বিশেষ যদিও কল্পনা ও ভ্রান্তিজালে আচ্ছন্ন হইয়াছে, তথাপি তাহাতে এরূপ বিস্ময়কর সত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে যে, তৎপাঠে চমৎকৃত হইতে হয়। উইডেল লিখিয়াছেন, "একজন নাবিক হলদ্বীপে নৌবাহন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। একদা একটী প্রাণী তাহার দৃষ্টিগোচর হয়, এই প্রাণীর স্বর যন্ত্রধ্বনির ন্যায় প্রতীত হইয়াছিল। নাবিক রাত্রি দশটার সময় প্রথমে মানবের কণ্ঠ-ধ্বনির ন্যায় শব্দ শুনিতে পাইল। যে সময় ও যে স্থানের বিষয় এস্থলে বর্ণিত হইতেছে, সে সময়ে ও সে স্থানে দিবালোক প্রায় তিরোহিত হয় না।

চারিদিক পরিষ্কার ছিল। ধ্বনি শ্রুতি-বিবরে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্র নাবিক শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিল; কিন্তু কিছুই দৃষ্টিগোচর না হওয়াতে আপনার শয্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল, পুনর্ব্বার সেই শব্দ সমুত্থিত হইল, নাবিক পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান করিল, কিন্তু এবারেও কিছুই তাহার নয়ন গোচর হইল না। নাবিক সাগরের সিকতাময় প্রদেশে অবতরণ করিয়া পাদ চারণা করিতে লাগিল, এবার সেই স্বর অধিকতর স্পষ্টরূপে যন্ত্রধ্বনির ন্যায় তাহার শ্রুতিপথবর্ত্তী হইল। ইহা শুনিয়া সে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান পূর্ব্বক দেখিল, সাগর হইতে কিছু দূরে প্রস্তর খণ্ডের উপর কোন পদার্থ রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া প্রথমে সে কিছু ভীত হইল, দৃশ্যমান জীবের মুখ ও পৃষ্ঠদেশ মনুষ্যের মুখ ও পৃষ্ঠের ন্যায়; পৃষ্ঠে হরিদ্বর্ণ কেশরাশি বিলম্বিত ছিল। পুচ্ছের আকার সীল মৎস্যের পুচ্ছ সদৃশ। এই অদৃষ্টচর জীব ক্রমাগত যন্ত্রধ্বনির ন্যায় শব্দ করিতেছিল। নাবিক দর্শনমাত্র স্থিরভাবে দুই মিনিট কাল তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। দুই মিনিট পরে ইহা বিশাল সাগরের বারি রাশির গর্ভে বিলীন হইয়া গেল। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রাণী দেখিবামাত্র নাবিক তাহার ঊর্দ্ধতম কর্ম্মচারীকে জানাইল, এবং পরিদৃষ্ট ঘটনার যাথার্থ্য প্রতিপাদনার্থ সৈকত ভূমিতে পবিত্র ক্রুশ অঙ্কিত করিয়া বারম্বার তাহা চুম্বন পূর্ব্বক শপথ করিতে লাগিল। এই নাবিক আমার সমক্ষে এরূপ দৃঢ়তার সহিত শপথ করিয়া এই ঘটনার বর্ণনা করিয়াছিল যে, আমি ভাবিয়াছিলাম সে যথার্থই বর্ণিত প্রাণী দেখিয়াছে, এই বিষয় ধীরভাবে স্বীয় কল্পনায় রঞ্জিত করিয়া প্রকাশ করিতেছে।”

উল্লিখিত বর্ণনায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে, সীল মৎস্যের কোন এক বিশেষ জাতি নাবিকের নেত্রগোচর হইয়াছিল। ঈদৃশ

অদ্ভুত প্রাণীর বিবরণ আরও অনেক স্থলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হডসন্ নামে একজন বিখ্যাত নাবিক এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "আমাদের দলের এক ব্যক্তি অর্ণবপোত হইতে একটী প্রাণী দৃষ্টি করে; ইহা আমাদের পোতের অতি নিকটে আসিয়াছিল, এই সামুদ্রিক জীবের দেহের আয়তন আমাদের দেহের আয়তনের তুল্য। ইহার পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষঃস্থল স্ত্রীলোকের পৃষ্ঠ ও বক্ষোদেশের ন্যায়। দেহের চর্ম্ম সাতিশয় শুভ্র। সুদীর্ঘ কেশরাশি পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত রহিয়াছে। ইহার পুচ্ছদেশ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।" ডাক্তার রবার্ট হামিল্টনের তিমি ও সীল মৎস্যের ইতিবৃত্ত হইতে গোস্ সাহেব একটী অদ্ভুত সামুদ্রিক জীবের সম্বন্ধে এই বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, "সেটলাণ্ড্ দ্বীপ শ্রেণীতে ইয়েল নামে একটী দ্বীপ আছে। এই দ্বীপে মৎস্য-ব্যবসায়িগণ একটী সমুদ্রচর জীব ধৃত করিয়াছিল। ইহার দৈর্ঘ্য তিন ফিট। দেহের পূর্ব্ব ভাগ মানব শরীরের ন্যায়; বক্ষোদেশ নারী জাতির বক্ষঃস্থলের ন্যায় উন্নত। মুখ, ললাট ও গ্রীবা ক্ষুদ্র, এই সকল প্রত্যঙ্গের সহিত মানব জাতির দেহাংশের সাদৃশ্য আছে। বাহুদ্বয় ক্ষুদ্র, ইহা বক্ষঃস্থলে জড়ান ছিল। অঙ্গুলিগুলি সূক্ষ্ম ও পরস্পর পৃথক ভাবে অবস্থিত। দেহের চর্ম্ম অতিশয় কোমল ও ধূসর বর্ণ। শরীরের অপরাপর ভাগ মৎস্যাবয়ব। ধরিবার সময় ইহা আত্ম-রক্ষার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করে নাই, কিম্বা কাহাকেও দংশন করিতে সমুদ্যত হয় নাই। কেবল ক্ষীণ ও আর্ত্তস্বরে আপনার মর্ম্ম বেদনা জানাইয়াছিল। ছয়জন নাবিক এই অদ্ভুত জীবকে ধরিয়া আপনাদের নৌকায় লইয়া যায়। কিন্তু ধীবরদিগের অসাবধানতা বা কুসংস্কারজনিত ভীতিনিবন্ধন বন্ধন-রজ্জু শিথিল হইয়া যাওয়াতে ইহা লম্বভাবে জলরাশির গর্ভে প্রবেশ করে।" এই সকল অদ্ভুত সামুদ্রিক প্রাণীর বিবরণ এপর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক

গবেষণায় সুমার্জ্জিত বা সুপরিষ্কৃত হয় নাই। কল্পনাসম্ভূত ভাবিয়া কেহ এসকল বিষয়ের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিয়াছেন, বিজ্ঞানের অনায়ত্ত ভাবিয়া কেহবা এবিষয়ে নিবস্ত রহিয়াছেন।

উল্লিখিত জীবদেহেব বিববণ ব্যতীত কাটল মৎস্য ও সৈন্ধব সর্পেব বিববণও সাতিশয় বিস্ময়জনক। ১৮৭৩ অব্দে দুইজন ধীবব আমেবিকাব অন্তর্ব্বর্ত্তী নিউ ফাউণ্ড্‌ল্যাণ্ডে একটী কাটল মৎস্য দেখিতে পায়। ইহা অত্যন্ত বৃহদবয়ব বলিয়া অনুমিত হইযাছিল। ধীবরগণ যখন এই মৎস্যটীকে আক্রমণ করে, তখন ইহা ক্রোধভবে একটী ডানা দ্বাবা আক্রমণকাবিদেব অধিষ্ঠিত নৌকার উপবিভাগে আঘাত কবিযাছিল, একজন ধীবব বিশিষ্ট সত্ত্বরতাসহকারে কুঠাব দ্বাবা এই ডানাব কিয়দংশ ছেদন করিযা লয়। এই ছিন্ন অংশেরও প্রায় ছয়ফিট ঘটনাক্রমে বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহাব অবশিষ্ট ডানার দৈর্ঘ্য ১৯ ফীট হইযাছিল। নাবিকেবা এই কাটল মৎস্যের দেহের দৈর্ঘ্য ৬০ ফীট ও ব্যাস ৫ ফীট অনুমান করিসাছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবওযে দেশীয একজন পণ্ডিত স্বপ্রণীত প্রাণিবৃত্তান্তে একটী সুবৃহৎ সৈন্ধব সর্পেব বিবরণ লিপিবদ্ধ কবেন। ইহাব পরে এই সর্পের সম্বন্ধে অনেক আন্দোলন হইয়া আসিয়াছে। ১৮১৭ অব্দেব আগষ্ট মাসে এইরূপ একটী সর্পাকাব বৃহৎ জীব মাসাচিউসেট্‌সের অন্তঃপাতী আন অন্তবীপেব নিকট পবিদৃষ্ট হয। প্রসিদ্ধ নামা এগার জন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটদিগেব সমীপে যথাবীতি শপথ কবিয়া এ বিষযে সাক্ষ্য প্রদান কবেন। এই মাজিষ্ট্রেটদিগের একজন উল্লিখিত প্রাণী দর্শন করেন, সুতবাং তাঁহাকেও যথানিযমে সাক্ষ্য দিতে হয়। প্রস্তাবিত জীবেব অবযব সর্পাকার, দেহ গভীব পাটলবর্ণ, মস্তক ও গ্রীবায শ্বেতবর্ণ রেখা আছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৫০ হইতে ১০০ ফীট পর্য্যন্ত

অনুমিত হইয়াছিল। মস্তকের আকার সর্পের মস্তকের ন্যায়, কিন্তু উহা ঘোটকের মস্তকের ন্যায় বৃহৎ। মস্তকে কেশর আছে কি না, সে সম্বন্ধে কেহ কিছু নির্দ্দেশ করেন নাই। কাপ্তেন মাকুহে নামে একজন ব্রিটীষ পোতাধ্যক্ষ ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সাগরের বারিরাশিতে আর একটী সুবৃহৎ সর্পাকার প্রাণী দর্শন করেন। মাকুহে তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী গেজ সাহেবকে এই মর্ম্মে এক-খানি পত্র লিখিয়াছিলেন—"৬ই আগষ্ট অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় আকাশ মণ্ডল অন্ধকারময় ও মেঘাচ্ছন্ন ছিল, অর্ণবযান মহা-সাগরের তরঙ্গাবলির মধ্য দিয়া উত্তর পূর্ব্বাভিমুখে যাইতেছিল, আমি কয়েকজন সহযোগী কর্ম্মচারীর সহিত যানের উপরিভাগে পাদচারণা করিতে ছিলাম, এমন সময়ে এক জন কর্ম্মচারীর নিকট শুনিতে পাইলাম, কোন একটী অভূতপূর্ব্ব পদার্থ দ্রুত-গতিতে যানের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। এই পদার্থ ক্রমে আমাদের নয়ন-গোচর হইল, ইহা একটী সুবৃহৎ সর্প। সাগরতল হইতে ইহার পৃষ্ঠদেশ ও মস্তক প্রায় ৪ ফীট ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছিল, এই জীবের অন্ততঃ ৬০ ফীট পরিমিত দেহ সাগরতলে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। ইহার দেহ গভীর পাটল-বর্ণ, কেবল হরিতাভ-শ্বেতরেখা গলদেশে বিরাজমান ছিল। ইহার মস্তকের নিম্নভাগের ব্যাস ১৫ হইতে ১৬ ইঞ্চি পরিমিত হইবে। ইহার পার্শ্বদেশে কোনরূপ ডানা ছিল না। কেবল পশ্চাদ্ভাগে ঘোটকের কেশর অথবা সমুদ্র-শৈবালের ন্যায় এক-প্রকার পদার্থ দেখা যাইতেছিল। এই সামুদ্রিক জীব অর্ণবযানস্থ অনেকের প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল।"

কাপ্তেন মাকুহের বর্ণিত জীবের প্রতিরূপ ১৮৪৮ অব্দের ২৮এ অক্টোবরের সচিত্র লণ্ডনসংবাদ নামক বিলাতের প্রসিদ্ধ পত্রে প্রকাশিত হয়।

মীরাবাই।

মীরাবাই ঈশ্বরভক্তি ও ঈশ্বর-প্রেমে নিমগ্ন হইয়া যেরূপ কঠোর ব্রত প্রতিপালন করিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখে তাচ্ছীল্য দেখাইয়া মূর্ত্তিমতী সারস্বতী শক্তির ন্যায় যেরূপ তদ্গতচিত্তে স্বীয় বরণীয় দেবতার গুণ গান করিয়াছেন, অবলা-প্রকৃতিতে সেরূপ তপস্বি-ধর্ম্ম প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। নিম্ন-লিখিত বিবরণ পাঠে সেই ঈশ্বর-নিষ্ঠা ও ভক্তিপরায়ণতা অনুমিত হইবে।

মীরাবাই মেরতা নামক রাজপুতনার একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের জনৈক রাঠোর বংশীয় রাজার কন্যা। মিবারের রাণা কুম্ভের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কুম্ভ ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে মিবারের সিংহা-সনে অধিরোহণ করেন। মীরা অনুপযুক্ত ব্যক্তির সহিত পরি-ণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন নাই। সাহস, পরাক্রম ও শাসন-দক্ষতায় কুম্ভ মিবারের ইতিহাসে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। যে গৌরবসূর্য্য দৃষদ্বতী নদীর তীরে অনন্তপ্রসারিত শোণিত সাগরে নিমগ্ন-প্রায় হইয়াছিল, দুরন্ত পাঠান-বাহুর পরাক্রমে যাহার প্রচণ্ড কিরণ অন্ধকারে পরিণতি পাইয়াছিল, রাণা কুম্ভের ক্ষমতা-বলে তাহা ধীরে ধীরে সমস্ত মিবার আলোকিত করিয়া তুলে। কুম্ভ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল মিবারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। তিনি অসামান্য পরাক্রমে ও অসা-মান্য সদাশয়তায় তৎসমকালীন অনেক রাজাকে অধঃকৃত করিয়াছেন। খিলিজি-বংশের অত্যয়ে কয়েকটী মুসলমান রাজ্য দিল্লীর অধীনতা-শৃঙ্খল উচ্ছেদ করিয়া স্বপ্রধান হইয়া উঠে। ইহাদের মধ্যে মালব ও গুজরাটের অধিপতি সমবেত

হইয়া রাণাকুম্ভের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হন। ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে মালবের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হয়। কুম্ভ একলক্ষ সৈন্য ও চতুর্দ্দশ শত হস্তী লইয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, এবং প্রভূত পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক বিপক্ষদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া স্বীয় রাজধানী চিতোরে প্রত্যাগমন করেন। এই যুদ্ধে মালবের অধিপতি কুম্ভের বন্দী হন, কুম্ভ পরাজিত শত্রুর প্রতি অসৌজন্য প্রদর্শন করেন নাই। তিনি বীরধর্ম্ম ও বীর-পদ্ধতি অনুসারে সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভের আশায় অতুল পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পরিশেষে বিজয়ী হইয়া সেই বীরধর্ম্মের অবমাননা করেন নাই, এবং সেই বীরপদ্ধতিরও গৌরবহারী হন নাই। কুম্ভ মালবের অধিপতিকে অনেক অর্থ দিয়া বন্দিত্ব হইতে বিমুক্ত করেন। এই কার্য্যে কুম্ভের একদিকে যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ পাইতেছে, অন্যদিকে সেইরূপ সৌজন্য ও সদাশয়তা পরিস্ফুট হইতেছে।

কুম্ভ মিবারে অনেকগুলি জয়স্তম্ভ ও অনেকগুলি গিরিদুর্গ নির্ম্মাণ করেন। মিবার রক্ষার্থ যে চৌরাশীটী দুর্গ নির্ম্মিত হয়, তাহার মধ্যে চৌত্রিশটী রাণা কুম্ভের সংগঠিত। কুম্ভমির (প্রচলিত নাম কমলমির) রাণাকুম্ভের অসাধারণ কীর্ত্তি-স্তম্ভ। এই দুর্গ শত্রুগণের অভেদ্য বলিয়া চিরকাল রাজস্থানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে। রাণাকুম্ভের গুণ-গৌরব কেবল এই সমস্ত কার্য্যেই পর্য্যবসিত হয় নাই, সুকবি ও সুবিদ্বান্ বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হয়। কুম্ভ বঙ্গীয়-কবি-কুল শিরোমণি জয়দেবের প্রণীত গীতগোবিন্দের এক খানি টীকা প্রস্তুত করেন। কিন্তু এই টীকা এক্ষণে সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মীরা বাই কিরূপ সৌভাগ্য-

লক্ষ্মীর ক্রোড়ে সমর্পিত হইয়াছিলেন, তাহা পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত এই সুযোদ্ধা, সুরাজা ও সুবিদ্বানের সম্বন্ধে এত কথা লিখিত হইল। মীরাবাই পতির এই সৌভাগ্য সুখের কতদূর অংশ-ভাগিনী হইযাছিলেন, এক্ষণে তাহাই বিবৃত হইতেছে।

ভক্তি হৃদয়ের সঞ্জীবনী শক্তি। যদি ক্ষণকালের জন্যও ভক্তির কার্য্য স্থগিত হয়, তাহা হইলে হৃদয় বিশুষ্ক ও বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় সাতিশয় শোভাহীন হইয়া পড়ে। ভক্তি নিয়ত ঊর্দ্ধগামিনী। গতি ও উত্থান বিষয়ে ইহা কল্পনাকেও অধঃকৃত করিয়া থাকে। যাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা ভক্তিরসে পরিপ্লুত থাকে, তিনি মানব হইয়াও দেবলোকের পবিত্রতম সুখ সম্ভোগ করেন, এবং মর্ত্ত্য হইয়াও অমরভোগ্য পবিত্র সুধার রসাস্বাদ করিয়া থাকেন। পৃথিবীতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোমদ, যাহা কিছু প্রীতিপ্রদ, তৎসমুদয়ই এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া নিয়ত তাঁহার সেবা করিয়া থাকে। ভক্তি কখনও কোন প্রকার পার্থিব পঙ্কে কলুষিত হয় না। ইহা পবিত্র-সলিলা স্রোতস্বতীর ন্যায় নিয়তই স্বচ্ছ, আবিলতাবর্জ্জিত ও জীবন-তোষিণী। যথার্থ ভক্তিমান ব্যক্তি কখনও নীচতা বা হীনতার কর্দ্দমে নিমগ্ন থাকেন না। তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা নির্ম্মল ও কমনীয় থাকে। তিনি ভ্রমর-চুম্বিত প্রভাত-কমলের মনোহর মাধুরী দেখিয়া যেমন পরিতৃপ্ত ও সুখী হন, অনন্ত জড় জগতের অনন্ত শক্তির বিকাশ দেখিয়াও তেমনই সুখী ও পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। তরঙ্গায়িত সাগরের ভীষণ মূর্ত্তি, চঞ্চল তড়িল্লতার অপূর্ব্ব বিকাশ, সমুন্নত ভূধর-মালার গম্ভীর দৃশ্য, দিগ্‌দাহকারী দাবানল, প্রলয়ঝঞ্ঝাবায়ু প্রভৃতিতে তাঁহার হৃদয় সেই অনন্ত শক্তির অনন্ত স্রোতের সহিত মিশিয়া যায়। তিনি সংসারী হইয়াও যোগী, মানব হইয়াও দেবলোক-বাসী এবং সংসার-

সমুদ্রের নগণ্য জল-বুদ্ বুদ্ হইয়াও মহীয়সী শক্তির অদ্বিতীয় অবলম্বন। এ নশ্বর জগতে—এ জীবলোকের ক্ষণপ্রভাবৎ ক্ষণিক বিকাশে কাহারও সহিত তাহার তুলনা সম্ভবে না।

যথার্থ ভক্তি এইরূপ পবিত্র ও অনবদ্য, যথার্থ ভক্তিমানের হৃদয় এইরূপ উচ্চতম গ্রামে সমারূঢ়। ভক্তি অনেকবিষয়ের দিকে প্রধাবিত হইয়া থাকে, ইহার মধ্যে দেবতার দিকে যে ভক্তি প্রধাবিত হয়, মীরাবাই তাহারই জন্য সকলের নিকট শ্রদ্ধা ও প্রীতি পাইতেছেন। দেবভক্তি অপূর্ণকে পরিপূর্ণ ও অসুন্দরকে সৌন্দর্য্যের রেখাপাতে সুশোভিত করে। মনুষ্য এই জড় জগতে ক্ষুদ্রতম জীব। প্রতি মুহূর্ত্তেই ইহার অস্থায়ি শরীরের স্থিরাংশের ধ্বংস হইতেছে। ঊর্ম্মিমালা যেমন গৌরবে কিয়ৎ-ক্ষণ বক্ষঃ স্ফীত করিয়া জলগর্ভে বিলয় পায়, বিদ্যুল্লতা যেমন মুহূর্ত্তমাত্র প্রভা বিকাশ করিয়া নবজলধর-সমূহে অন্তর্হিত হয়, নশ্বর মানবও তেমনই এই নশ্বর জগতে কিয়ৎক্ষণ লীলা করিয়া কালের অনন্ত স্রোতে বিলীন হইতেছে। অপূর্ণ ও অস্থায়ী জীব ইহা বিবেচনা করিয়া ভক্তির সাহায্যে সহজেই সেই পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ পরাৎপরে সংযতচিত্ত হইয়া থাকে। পরিদৃশ্যমান সংসারের অস্থায়িত্ব ও নিজের অস্তিত্বের অস্থায়িত্ব ভাবিয়া মনুষ্য আপনা হইতেই অনন্তশক্তিমান দেবতার শরণ লয়, এবং এই দেব-ভক্তির বলে সৌন্দর্য্যের উচ্চতম মন্দিরে আরোহণ করিয়া পবিত্র আনন্দের রসাস্বাদ করিতে থাকে। কেহ শিখায় না, কেহ বলিয়া দেয় না, তথাপি এই ভক্তি ঊর্দ্ধে উড্ডীন হইয়া মনুষ্যকে বরণীয় দেবতার স্বরূপ-চিন্তায় নিয়োজিত করে। এই জন্য সাধনা বলবতী হয় এবং এই জন্যই তপস্যা মহীয়সী হইয়া থাকে। তরঙ্গিণী যেমন সাগরের দিকে অবিরাম-গতি প্রবাহিত হয়, ভক্তির প্রবল বেগে সাধনা ও তপস্যাও

সেইরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের দিকে প্রধাবিত হইয়া থাকে। কেহই এই অসীম ভক্তির গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। যিনি শক্তিতে অসীম, দয়ায় অসীম, পরিমাণে অসীম; অসীম ভক্তিস্রোত যখন তাঁহাকে পাইবার জন্য তাড়িত বেগকেও উপহাস করিয়া ধাবমান হয়, তখন সঙ্কীর্ণ-শক্তি, সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধি ও সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ সামান্য মানব কিছুতেই সে স্রোত আপনার ক্ষমতায়ত্ত করিতে পারে না। এরূপ স্থলে মানবী শক্তি আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া আইসে, এবং কূর্ম্মের ন্যায় আপনাতেই আপনি লুক্কায়িত হইয়া থাকে।

মীরাবাই এই দেব-ভক্তির বলে অটল হইয়া সমুদয় পার্থিব সুখ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বিধাতা যদিও তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার গুণসম্পন্ন ও সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তির আধিপত্য দিয়াছিলেন, তথাপি মীরার ভাগ্যে ভোগ-সুখ ঘটিয়া উঠে নাই। মীরা সাতিশয় বিষ্ণু-ভক্তি-পরায়ণা ছিলেন। তিনি স্বামি-গৃহে যাইয়া পরম-বৈষ্ণবী হইয়া উঠিলেন, এবং আত্ম-সংযত ও ভক্তিপরায়ণ হইয়া রণছোড় নামক আরাধ্য কৃষ্ণ মূর্ত্তির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এদিকে তাঁহার স্বামীর অন্যান্য পরিবারবর্গ প্রগাঢ় শক্তি-উপাসক ছিলেন। এজন্য স্বামি-গৃহে গমনের অব্যবহিত পরেই মীরার সহিত তাঁহার শ্বশ্রূর ধর্ম্ম বিষয়ে উৎকট বিবাদ আরম্ভ হইল। মীরার শ্বশ্রূ মীরাকে বিষ্ণু উপাসনায় বিরত ও শক্তি উপাসনায় প্রবৃত্ত করিতে অনেক চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা কিছুতেই ফলবতী হইল না। মীরা যে ভক্তির স্রোতে দেহ ভাসাইয়া-ছিলেন, রাজমাতা সে স্রোত নিরুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। এজন্য রাজমাতা মীরাকে গৃহ হইতে নিষ্কাশিত করিলেন। মীরা গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন বটে, কিন্তু ভক্তি হইতে স্খলিত

হইলেন না। তিনি যে ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, প্রগাঢ় ভক্তি-যোগ সহকারে তাহা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, রাণা কুম্ভ মীরার আবাসের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্থান ও ভরণপোষণের জন্য কিছু অর্থ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। যাহাহউক, মীরা স্বামি-গৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রণছোড়ের আরাধনায় রত হইলেন। অনেক নিরাশ্রয় বৈরাগী তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিল। মীরা এইরূপে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়-ভূমি হইয়া দয়া-ধর্ম্ম-পরায়ণা তপস্বিনীর ন্যায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে মীরা বাই মথুরা ও দ্বারকা তীর্থে গমন করেন। কথিত আছে, মীরা যৎকালে দ্বারকায় ছিলেন, তৎকালে রাণা আপনার অধিকারস্থ বৈষ্ণবদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। কয়েক জন ব্রাহ্মণ এই সময়ে মীরাকে আনয়ন করিবার জন্য দ্বারকায় প্রেরিত হন। মীরা দ্বারকা হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে আপনার আরাধ্য দেবের নিকট বিদায় লইবার নিমিত্ত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া উপাসনা আরম্ভ করিলেন। উপাসনা সমাপ্ত হইলে কৃষ্ণ-মূর্ত্তি দ্বিধা বিভক্ত হইল এবং মীরা তাহাতে প্রবেশ করিবামাত্র উহা পূর্ব্ববৎ অবিভক্ত হইয়া গেল। এই অবধি মীরাবাই চিরকালের মত নরলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অদ্যাপি মিবারে রণছোড় নামক কৃষ্ণ-মূর্ত্তির সহিত মীরা বাইর পূজা হইয়া থাকে। সাধারণে নির্দ্দেশ করে যে, এই পূজা রণছোড়ের অভ্যন্তরে মীরা বাইর অন্তর্দ্ধানের স্মরণ-সূচক ব্যতীত আর কিছুই নহে।

মীরা বাইর কোন ধারাবাহিক জীবনচরিত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহার জীবনী-সম্বন্ধীয় প্রায় সমস্ত ঘটনাই এক্ষণে উপকথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। মীরা পরমসুন্দরী ছিলেন।

সৌন্দর্য্য-গরিমায় তৎকালে প্রায় কেহই তাঁহার তুলনীয়া ছিল না। কিন্তু তাঁহার বাহ্য সৌন্দর্য্য অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্য অধিক ছিল। তাঁহার যতটুকু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই ঈশ্বর-ভক্তি, ঈশ্বর-প্রেম ও স্বার্থত্যাগের অসাধারণ চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। মীরা দেবভক্তির নিমিত্ত অতুল রাজত্ব-সুখ ও অতুল ভোগ-বিলাসে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহার জন্য তাঁহার কিছুমাত্র মনঃক্ষোভ উপস্থিত হয় নাই। প্রগাঢ় সাধনা ও প্রগাঢ় তপস্যায় তাঁহার হৃদয় চির-প্রফুল্ল থাকিত। মীরা বাইর অন্তর্দ্ধান-ঘটনা যদিও নিরবচ্ছিন্ন কল্পনা-মূলক ও অবিশ্বাস-যোগ্য, তথাপি উহা তাঁহার উৎকট সাধনার পরিচয় দিতেছে। বস্তুতঃ মীরাবাই যে আপনার সাধনায় অনেকাংশে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সাধনা ও তপস্যার জন্যই তিনি অনেকের নিকট দেবীভাবে পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

মীরা বাই সুকবি ছিলেন। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তি-প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হয়, কবিতার মোহিনী মাধুরী সহজেই তাঁহার শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইয়া থাকে। পবিত্র ভক্তির মহিমায় মীরার কবিতাও হিমাচল-নিঃসৃতা পবিত্র-সলিলা জাহ্নবীর ন্যায় অবিরল ধারায় নির্গত হইত। মীরা বাইর রচিত পদাবলি অনেকে আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন। কোন কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উপাসনা-পদ্ধতি মধ্যে তাঁহার রচিত অনেক সংগীত প্রাপ্ত হওয়া যায়। রচনা-নৈপুণ্য ব্যতীত মীরা বাইর সঙ্গীত শাস্ত্রেও অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। কথিত আছে, সুপ্রসিদ্ধ মোগল সম্রাট্ আকবর সাহ মীরা বাইর অসামান্য সঙ্গীত-শক্তির বিবরণ শুনিয়া প্রসিদ্ধ সংগীতবিৎ তানসেনকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট গমন করেন, এবং তদীয় কোমল কণ্ঠ-বিনিঃসৃত

সুমধুর গীতাবলি শ্রবণ করিয়া পরিতুষ্ট হন। বোধ হয়, কোন গ্রন্থকার মীরা বাইকে আকবর সাহের সমকালবর্ত্তিনী বলিয়া উল্লেখ করাতেই এইরূপ কিম্বদন্তীর প্রচার হইয়াছে। কিন্তু এই নির্দ্দেশ সমীচীন বোধ হয় না।

মীরা বাইর নামে একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বর্ত্তমান আছে। এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা মীরা বাই এবং তাঁহার ইষ্টদেব রণ-ছোড়কে বিশিষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

মেঘ।

অসীম জড় জগতের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের অনন্ত কৌশল লক্ষিত হয়। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের গবেষণাবলে এই প্রাকৃতিক তত্ত্ব অনেকাংশে সুপরিস্ফুত ও সুবোধ্য হইয়াছে। গগন-বিহারী মেঘের বিষয় এস্থলে বর্ণিত হইতেছে। এই মেঘেও বিশ্বপাতার অপূর্ব্ব কৌশল পরিদৃষ্ট হইবে।

সূর্য্যের উত্তাপে জলভাগ হইতে বাষ্প ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে। এই বাষ্প উপরিস্থিত আকাশে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে ঘনীভূত হইয়া মেঘ রূপে পরিণত হয়। সচরাচর আমরা যে কুজ্ঝটিকা দেখিতে পাই, মেঘের সহিত তাহার কোন বিশেষ বৈলক্ষণ্য নাই। বস্তুতঃ মেঘ ও কুজ্ঝটিকা এক উপাদানেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঘনীভূত বাষ্পরাশি ভূমির অব্যবহিত উপরে বা কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে বিলম্বিত হইলে কুজ্ঝটিকা নামে অভিহিত হয়, এবং উহা ঊর্দ্ধস্থিত বায়ু-প্রবাহে ভাসমান হইলে মেঘ নামে উক্ত হইয়া থাকে। সুবিশাল সাগর-তল, উত্তুঙ্গ শৈল-শিখর, সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র, যেখানে হউক, জলীয় বাষ্প বায়ুর নিম্নস্থিত স্তরে বর্ত্তমান থাকিলেই কুজ্ঝটিকা হইল, আর উহা ঊর্দ্ধ গগনে বিচরণ করিলেই "মেঘ" বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিল। কেবল অবস্থান অংশে কুজ্ঝটিকার সহিত মেঘের এইরূপ বিভিন্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে। আকার ও বর্ণ বিষয়ে মেঘের সহিত কুজ্ঝটিকার যে প্রভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল দূরতা প্রযুক্ত সংঘটিত হইয়া থাকে। মেঘ কুজ্ঝটিকা অপেক্ষা বহুদূর ঊর্দ্ধে অবস্থিত, উহাতে সূর্য্য-কিরণ প্রতিফলিত হইলে নানাবিধ বর্ণ

আমাদের নয়নগোচর হয়; কুজ্ঝটিকাতে যদিও সূর্য্য-কিরণ সংস্পৃষ্ট হয়, তথাপি উহা অত্যন্ত নিকটে অবস্থিতি করাতে আমরা উহার বিভিন্ন বর্ণ কিছুই বুঝিতে পারি না।

মেঘ অতিশয় চঞ্চল। ইহা কখনও স্থিরভাবে অবস্থান করে না। অনন্ত আকাশে বায়ু-প্রবাহ নিয়ত নানা দিকে প্রবাহিত হইতেছে, মেঘ-সমূহও এই বায়ু-রাশির সহিত নিরন্তর নানাদিকে প্রধাবিত হইতেছে। নিম্নস্থিত বায়ুরাশি যে দিকে প্রবাহিত হয়, ঊর্দ্ধস্থিত বায়ুরাশি অনেক সময়ে তাহার বিপরীত দিকে গমন করে, এইজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, নিম্নের মেঘ-খণ্ড যে দিকে পরিচালিত হইতেছে, ঊর্দ্ধের মেঘখণ্ড তাহার বিপরীত দিকে ধাবিত হইয়া থাকে। এইরূপে ঊর্দ্ধস্থিত মেঘ সমূহ বিভিন্ন দিক্‌গামী বায়ু-প্রবাহের বলে বিভিন্ন দিকে পরি-চালিত হইতেছে। সচরাচর যে মেঘ খণ্ড নিশ্চল বলিয়া প্রতীত হয়, যন্ত্র দ্বারা দর্শন করিলে তাহারও চঞ্চলতা প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে।

অসীম আকাশ-মণ্ডলে অনন্ত বায়ুস্তর বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সকল বায়ুস্তরের তাপমান পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি-বিশিষ্ট। এতন্নিবন্ধন সর্ব্বদা নূতন নূতন মেঘের উৎপত্তি ও বিলয় দেখিতে পাওয়া যায়। উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু-প্রবাহ অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু-প্রবাহের সহিত সংস্পৃষ্ট হইলে সেই উষ্ণবায়ুস্থিত বাষ্প সমূহের কিয়দংশ মেঘাকারে পরিণত হয়। আবার যখন মেঘ-সমূহ উষ্ণ বায়ু-প্রবাহের সহিত সংহত হয়, তখন মেঘের জলকণা সকল বায়ুর উষ্ণতায় পুনর্ব্বার বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া উঠে, সুতরাং মেঘখণ্ড বিলুপ্ত হইয়া যায়। আকাশ-পথে নিরন্তর উষ্ণ ও শীতল বায়ু ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে, সুতরাং তৎসঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা নূতন নূতন মেঘের আবির্ভাব ও তিরোভাব হই-

তেছে। মেঘ যতই ঊর্দ্ধাভিমুখে উত্থিত হয়, ততই উহা শীতল বায়ু-রাশির সংস্পর্শে পুষ্টাবয়ব হইতে থাকে, এবং উহা যতই নিম্নাভিমুখ হয়, নিম্নস্থিত উষ্ণ বায়ু-রাশির সংস্পর্শে অভ্যন্তরস্থ জলকণা সমূহ বাষ্পাকারে পরিণত হওয়াতে ততই উহার অবয়ব হ্রস্ব হইয়া পড়ে। মেঘের গতি নিতান্ত অল্প নহে। আমরা যে সমস্ত মেঘ-খণ্ডকে মন্দগামী বলিয়া নির্দ্দেশ করি, দ্রুতগামী বায়ুর বেগে তাহা ঘণ্টায় ৬-।৭০ ক্রোশ পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়, পর্ব্বতের উন্নত শৃঙ্গদেশে মেঘ-খণ্ড স্থিরভাবে লম্বমান রহিয়াছে, বায়ুর প্রবল বেগেও উহা স্থানচ্যুত হইতেছে না। এই আশু প্রতীয়মান স্থিরতার কারণ আর কিছুই নহে, তত্রত্য মেঘ-খণ্ড সকল বায়ুর প্রবল বেগে স্থানান্তরে উড়িয়া যায়, পরে আবার বায়ু-প্রবাহের শৈত্য ও উষ্ণতার সংস্পর্শে নূতন মেঘ সমুৎপন্ন হইয়া সেই স্থান পরিগ্রহ করে। এইরূপে মেঘের এক খণ্ড স্থানান্তরিত হইতেছে, আর এক খণ্ড উৎপন্ন হইয়া তাহার স্থান অধিকার করিতেছে, এই জন্য সহসা দেখিলে এই সকল মেঘ-খণ্ডকে নিশ্চল ও এক স্থানে অবস্থিত বোধ হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ঊর্দ্ধ আকাশে ভিন্ন ভিন্ন তাপমানের বায়ুরাশি প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু ঊর্দ্ধস্থিত বায়ু-স্তর নিম্নস্থিত বায়ু-স্তর অপেক্ষা শীতল. নিম্নের বায়ুরাশির তাপাংশ অধিক হইলে উহা ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে, এইরূপে ঊর্দ্ধে উঠিবার সময় উপরিস্থিত শীতল বায়ুর সহিত উহার সংস্পর্শ হওয়াতে অভ্য-ন্তরস্থ জলকণা সমূহ ঘনীভূত হইয়া মেঘের আকার ধারণ করে।

মেঘ দ্বারা আমাদের অধিষ্ঠান-ভূমি পৃথিবীর অনেক উপ-কার হয়। মেঘ হওয়াতেই বৃষ্টি দ্বারা ভূমি উর্ব্বরা হইয়া থাকে। অধিকন্তু মেঘ আমাদের চন্দ্রাতপের কার্য্য করিয়া

থাকে। সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে মেঘ ভাসমান থাকাতে তপনের প্রচণ্ড কিরণ পৃথিবীস্থ তৃণগুল্মাদি নষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। এতদ্ব্যতীত মেঘ পৃথিবীর তড়িৎ আকর্ষণ করিয়া অনেক মঙ্গল সাধন করে। মেঘে সর্ব্বদাই তড়িৎ অবস্থান করে, এই তড়িৎ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকৃতির তড়িৎকে আকর্ষণ করিয়া উহাকে নিশ্চেষ্ট করিয়া ফেলে।*

মেঘের সাধারণ বর্ণ ধূমের ন্যায়। কিন্তু সূর্য্যালোক উহাতে প্রতিফলিত হইলে নানাবিধ বর্ণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সূর্য্যরশ্মিতে সাত প্রকার বর্ণ আছে। মেঘসমূহ এই সকল বর্ণের আভায় রঞ্জিত হইয়া বিভিন্ন বর্ণের দৃষ্ট হয়। মধ্যাহ্নকালীন মেঘ উজ্জ্বল নীলবর্ণ, সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত সময়ে উহা রক্ত, পীত, নীল, লোহিত প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণে সুরঞ্জিত হইয়া উঠে। সচরাচর যে ইন্দ্রধনু দৃষ্ট হয়, তাহা আর কিছুই নহে, মেঘস্থিত বহুসংখ্য জলবিন্দুতে সূর্য্যের কিরণ প্রতিফলিত হইলেই উহা বিবিধ বর্ণে সুরঞ্জিত ধনুর উৎপত্তি করে। †

আমাদের দেশের কবিগণ মেঘকে কামরূপী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই নির্দ্দেশে অত্যুক্তি বা কল্পনার বিকাশ নাই।

---

* তড়িৎ দুই প্রকার, যৌগিক ও বিযোগিক। এক পদার্থে যৌগিক ও অন্য পদার্থে বিযোগিক তড়িৎ বর্ত্তমান থাকিলে ইহারা পরস্পর সম্মিলিত হইতে চেষ্টা করে, যদি উভয় পদার্থেই একবিধ তড়িৎ অবস্থান করে, তাহা হইলে এই বিভিন্ন তড়িদ্-বিশিষ্ট পদার্থ দ্বয় পরস্পর আকৃষ্ট না হইয়া বিযুক্ত হইয়া পড়িবে। এইরূপ আকর্ষণ ও বিক্ষেপন উভয়বিধ তড়িতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মানুসারে মেঘের তড়িৎ ও পৃথিবীর তড়িৎ পরস্পর সম্মিলিত হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া যায়।

† একখানি বহুকোণ-বিশিষ্ট কাচ অথবা ঝাড়ের কলমে সূর্য্যের শুভ্র আলোক নিপতিত হইলে দৃষ্ট হয় যে, উহা হইতে নীল, পীত, হরিৎ প্রভৃতি রশ্মি-শিখা নিঃসৃত হইতেছে। মেঘের প্রত্যেক জলবিন্দু এইরূপ বহুকোণ-বিশিষ্ট কাচের কার্য্য করে, সুতরাং উহার মধ্য দিয়া সূর্য্যালোক প্রসৃত হইলে নীল পীতাদি সাতটী কিরণ সুদূরগগনে ইন্দ্রধনুরূপে পরিণত হয়।

মেঘের আকার নিরূপণ করা সুসাধ্য নয়। বায়ুর ভিন্ন ভিন্ন গতিবশতঃ মেঘেরও ভিন্ন ভিন্ন আকার হইয়া থাকে। আকারের বিভিন্নতা প্রযুক্ত প্রাকৃত ভৌগোলিকগণ প্রথমতঃ মেঘের তিনটী বিভিন্ন আকৃতি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন ঃ—(১) অলক ; (২) স্তূপ, (৩) স্তর। ইহাদের পরস্পরের সংমিশ্রণে অপর চারি প্রকার শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ঃ—(১) অলকস্তূপ, (২) অলকস্তর, (৩) স্তূপস্তর ও (৪) বৃষ্টিপ্রদ। সুতরাং প্রথম তিন প্রকার মৌলিক, শেষ চারি প্রকার যৌগিক। নিম্নে ইহাদের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

অলকমেঘ, যে সকল মেঘ নভোমণ্ডলে চুর্ণিত কুন্তলের ন্যায় পরিদৃষ্ট হয়, তৎসমুদয়কে অলক মেঘ কহে। এই জলদজাল কখন বিলম্বিত কেশদামবৎ, কখন বা কুঞ্চিত চিকুরের ন্যায় প্রতিভাসিত হইয়া অনন্ত আকাশের শোভা বর্দ্ধন করে। এই মেঘ সর্ব্বাপেক্ষা লঘু, এতন্নিবন্ধন ইহা নভোমণ্ডলের উচ্চতর স্থানে অবস্থান ও পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। সচরাচর অলক-মেঘ ভূপৃষ্ঠ হইতে তিন মাইল ঊর্দ্ধে অবস্থিতি করে ; কখন কখন ৫।৬ মাইল ঊর্দ্ধেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল মেঘ বর্ষা-বাত্যাবিহীন সময়ে সমুদিত হয়। কিন্তু যদি ইহা ঊর্দ্ধে উদিত হইয়া ক্রমে অবনত ও ঘনীভূত হইতে থাকে, তাহা হইলে ঝঞ্ঝা বায়ুর সম্ভাবনা। সমস্ত দিন উত্তর দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইবার পর অলকমেঘ উদিত হইলে লোকে বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝা বায়ুর আশঙ্কা করে। যদি ইহা প্রথমে দীর্ঘসূত্রবৎ প্রতীত হইয়া পরে আনত হয়, এবং ক্রমে বর্ষপ্রদ মেঘের আকার ধারণ করে, তাহা হইলেও বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু অনেক সময়ে অলক মেঘের কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট না হইলে লোকে সুদিনেরই প্রত্যাশা করিয়া থাকে।

স্তূপমেঘ। এই মেঘ প্রথমতঃ স্বল্প মাত্রায় পরিদৃষ্ট হয়, পরে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া স্তূপাকারে সংহত হইতে থাকে। সূর্য্য-রশ্মিতে প্রদীপ্ত হইয়া স্তূপমেঘ নানাবিধ আকার ধারণ করে। কখন ইহা তুষার-সমাচ্ছন্ন অভ্রংলিহ শৈলমালার ন্যায়, কখন উত্তুঙ্গ শৈল-শিখরের ন্যায়, কখন বিক্ষেপণী-সংযুক্ত তরণীর ন্যায়, কখন বা হস্তী অশ্ব প্রভৃতি প্রাণিগণের ন্যায় দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালেই এই মেঘের উদ্ভব হইয়া থাকে। নিশা অবসানে ইহা ক্ষুদ্র খণ্ডাকারে নেত্রগোচর হয়, পরে ক্রমে ক্রমে এই সকল ক্ষুদ্র খণ্ড ঊর্দ্ধগামী উষ্ণ বায়ুর প্রভাবে একত্রিত হইয়া ঊর্দ্ধদেশে উঠিতে থাকে; মধ্যাহ্ন কালে অনেক উচ্চে উঠিয়া গোধূলি সময়ে নিম্নগামী শীতল বায়ুর সংস্পর্শে বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া অন্তর্হিত হয়। কিন্তু যদি এই মেঘ হঠাৎ রূপান্তরিত হইতে থাকে, এবং ইহার স্তূপ সকল ভাঙ্গিয়া, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখায় পরিণত হইয়া, যৌগিক মেঘের আকার ধারণ করে, তাহা হইলে বৃষ্টির সম্ভাবনা। অধিকন্তু এই মেঘ সূর্য্যাস্তের সময় উদিত হইয়া ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইলে লোকে ঝড়ের আশঙ্কা করে।

স্তরমেঘ।—যে সকল মেঘ পর্ব্বতকন্দর ও নদী প্রভৃতি জলাশয়ের উপর আস্তরণ ভাবে অবস্থিতি করে, তৎসমুদয়ের নাম স্তর। ইহা সচরাচর নিম্ন আকাশেই সমুদিত হয়। স্তরমেঘ স্তূপমেঘের বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত। স্তূপমেঘ প্রাতঃকালে সংঘটিত হইয়া মধ্যাহ্নকালে সাতিশয় বর্দ্ধিতাবয়ব হয়, পরিশেষে ক্রমশঃ হ্রস্বায়তন হইয়া অন্তর্হিত হইয়া যায়। স্তরমেঘ সন্ধ্যার সময় আবির্ভূত হইয়া রাত্রিতে বাড়িতে থাকে, এবং রাত্রিশেষে উহা ক্রমে ক্ষীণ হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হয়। যদি এই মেঘ প্রাতঃকালে

অন্তর্হিত না হইয়া ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র বৃষ্টি হইতে পারে।

অলক-স্তূপ।—যে মেঘ প্রথমে অলকরূপে প্রতিভাত হইয়া পরে স্তূপরূপে পরিণত হয়, তাহাকে অলক-স্তূপ নামে নির্দ্দেশ করা যায়। এই মেঘ যখন বায়ুবেগে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডাকারে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়, তখন উহা নভোমণ্ডলে তরঙ্গ-ভঙ্গীবৎ অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিয়া থাকে। অলকস্তূপ-মেঘ সাতিশয় স্বচ্ছ। ইহার অভ্যন্তর দিয়া সূর্য্য ও চন্দ্রের দেহস্থিত চিহ্ন সুস্পষ্ট নয়নগোচর হয়। অলক-স্তূপ মেঘমালার উদয়ে আকাশ মণ্ডল অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করে। নীরদনিকর-খণ্ড অলক ও স্তূপাকারে পবন-সঞ্চালিত হইয়া শূন্য দেশের নানাস্থানে নানা ভাবে বিচরণ করিতে থাকে। এই মেঘ ঊর্দ্ধ আকাশে থাকিলে গ্রীষ্মাধিক্য হয়, এবং নিম্ন আকাশে থাকিলে ঝড় ও বৃষ্টির আশঙ্কা জন্মে।

অলক-স্তর।—ইহা প্রথমে অলকরূপে উৎপন্ন হইয়া পরে স্তরের সহিত সংমিশ্রিত হয়। ইহার স্থূলতা অল্প, কিন্তু বিস্তৃতি অধিক। অলক মেঘ-খণ্ড-দ্বয় যদি নভোদেশে সমানান্তরালভাবে থাকিয়া পরস্পরকে পার্শ্বাপার্শ্বিভাবে আকর্ষণ করে, তাহা হইলে অলক-স্তর মেঘের উৎপত্তি হয়। এই মেঘ ঝড় ও বৃষ্টির প্রাক্কালে উঠিয়া থাকে। ইহা যত নিবিড় হয়, ততই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা অধিক হইতে থাকে। কখন কখন অলক-স্তর ও অলক-স্তূপ এক সময়ে আকাশে আবির্ভূত হইয়া যুদ্ধোন্মত্ত সৈন্যব্যূহের ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া থাকে। এই আক্রমণে ইহারা শীঘ্র শীঘ্র পূর্ব্বরূপ পরিবর্ত্তন ও অচিরস্থায়ী নূতন নূতন আকার ধারণ করে। মেঘ-মালার ঈদৃশ সংগ্রাম দর্শন করিলে হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়-রসের সঞ্চার

হইতে থাকে। অলক-স্তর মেঘের আবির্ভাব সময়ে সূর্য্য ও চন্দ্রের চতুর্দ্দিকে একটী পরিধি দৃষ্ট হয়। এই মণ্ডলাকার রেখা দ্বারা ঝড় ও বৃষ্টির অনুমান করা যায়।

স্তূপ-স্তর।—স্তূপস্তর স্তূপ ও স্তর এই উভয়বিধ মেঘের সম্মিলনে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সুদূর বিস্তৃত সমতল মেঘ-রাশির উপর এই মেঘ বৃহদাকার স্তূপের ন্যায় অবস্থান করে। প্রায়ই ঝটিকা বৃষ্টির পূর্ব্বে এই মেঘের উদয় হয়। এই মেঘ অলক-স্তর মেঘের আবির্ভাব সময়েও দৃষ্ট হইয়া থাকে। অলক-স্তর স্তূপ-স্তরের পর্ব্বতবৎ প্রকাণ্ড দেহের আপাদ-মস্তকে অস্পষ্ট রেখায় বিলম্বিত থাকিয়া নয়ন-রঞ্জন-শোভা ধারণ করে। জলযান আরোহণে পরিভ্রমণ সময়ে সুবিশাল বারিধিতল অথবা সুবিস্তীর্ণ নদ নদী হইতে তীরস্থিত বিচিত্র বৃক্ষলতা-সমাকীর্ণ বন-ভূমি অথবা গগনস্পর্শী শৈলমালা যেরূপ নেত্রপথে প্রতি-ভাসিত হয়, স্তূপস্তর জলদঘটাও তদ্রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই মেঘ যদি ঊর্দ্ধ আকাশে উত্থিত হইয়া লঘু ও কার্পাস-রাশির ন্যায় ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে ঝড়ের সম্ভাবনা, কিন্তু যদি নিম্নে অবনত হইতে থাকে, তাহা হইলে বৃষ্টি হইয়া থাকে।

বৃষ্টিপ্রদ মেঘ।—উল্লিখিত ছয় প্রকার মেঘের সম্মিলনে এক প্রকার ঘোর ধূম্রবর্ণ মেঘের উদ্ভব হয়। স্তূপ-স্তর মেঘ হইতেই প্রায় ইহা উদ্ভূত হইয়া থাকে। কখন অলক মেঘ হইতেও ইহার উৎপত্তি হয়। এই মেঘ প্রথমতঃ নীল বা কৃষ্ণবর্ণ হয়, পরে সীসক-বর্ণ হইয়া উঠে। এই সময়েই বৃষ্টির সূত্রপাত হয়। কখন কখন কৃষ্ণবর্ণ রূপান্তরিত হইবার পূর্ব্বেই বৃষ্টি হইতে থাকে। অলক-মেঘ বায়ু-প্রবাহে স্তূপ-স্তর মেঘের সহিত সম্মিলিত হইলে বৃষ্টি ও শীলাপাত হয়। যদি ইহা ঝড়ের সময় উদিত হইয়া ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহা হইলে

বজ্রপাতের সম্ভাবনা। এই মেঘ ভূপৃষ্ঠ হইতে সচরাচর এক সহস্র অবধি পাঁচ সহস্র ফুট পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে অবস্থিতি করে।

বৃষ্টিপ্রদ মেঘ ভূতল হইতে অনধিক অর্দ্ধ ক্রোশ ঊর্দ্ধে সংঘটিত হয়, অলক মেঘ দেড় ক্রোশ হইতে দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে পরিভ্রমণ করে। স্থূলতঃ অর্দ্ধ ক্রোশের নিম্নে ও তিন ক্রোশের ঊর্দ্ধে প্রায়ই মেঘ দৃষ্ট হয় না। সিমলা পাহাড় প্রভৃতি উচ্চ স্থানে অধিরোহণ করিলে সময়ে সময়ে নিম্ন ভাগে বৃষ্টি ও ঝটিকার সঞ্চার দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অশোক।

প্রাচীন ভারতের যে সকল ভূপতি আপনাদের কীর্ত্তি-প্রভাবে পবিত্র ইতিহাসের বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহারাজ অশোক সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহার সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুল প্রচার হয়; স্থানে স্থানে দীর্ঘিকা, সুপ্রশস্ত পথ, চৈত্য প্রভৃতি নির্ম্মিত হইতে থাকে, এবং ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থলে বৌদ্ধযতিদিগের আধিপত্য ও সম্মান পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। মহারাজ অশোক সুপ্রসিদ্ধ মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র এবং বিন্দুসারের পুত্র। ইনি ভারতবর্ষের অনেক স্থলে স্বীয় আধিপত্য প্রসারিত করেন।

বিন্দুসারের পৈতৃক সিংহাসন পাটলীপুত্র নগরে ছিল। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম সুসীম। একদা চম্পাপুরী হইতে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া মহারাজ বিন্দুসারকে সুভদ্রাঙ্গী নামে একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও সর্ব্বসুলক্ষণবতী কন্যা উপহার দেন। কোন সময়ে একজন দৈবজ্ঞ এই কন্যাকে দেখিয়া ব্রাহ্মণকে কহিয়াছিল, কন্যার যেরূপ সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইনি নিশ্চয়ই রাজমহিষী হইবেন। ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞের বাক্যে অটল বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক পাটলীপুত্র রাজের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কন্যা-রত্নকে উপহার স্বরূপ অর্পণ করেন।

মহারাজ বিন্দুসার কন্যারত্ন পাইয়া তাহাকে আপনার অন্তঃপুরবাসিনী করিলেন। সুভদ্রাঙ্গীর রূপ-লাবণ্য সন্দর্শনে রাজমহিষীদিগের হৃদয়ে ঈর্ষার সঞ্চার হইল। তাঁহারা পিতৃ-পরিত্যক্ত ব্রাহ্মণ-কন্যাকে সামান্য পরিচারিকার কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন। এই সময়ে সুভদ্রাঙ্গীর প্রতি ক্ষৌর-কার্য্য সম্পাদনের ভার সমর্পিত হইল। সুভদ্রাঙ্গী এই কার্য্যে ক্রমে

সুদক্ষা হইয়া উঠিলেন। একদা রাজমহিষীদিগের আদেশে সুভদ্রাঙ্গী মহারাজের ক্ষৌর-কর্ম্ম সম্পাদনার্থ গমন করিলেন। বিন্দুসার সুভদ্রাঙ্গীর ক্ষৌরকর্ম্মে পরিতুষ্ট হইয়া পুরস্কার দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে সুভদ্রাঙ্গী সলজ্জভাবে বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু পাটলীপুত্র-রাজ কন্যাকে নীচ-জাতীয়া ভাবিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তখন সুভদ্রাঙ্গী কহিলেন, "মহারাজ। আমি জাত্যংশে নিকৃষ্টা নহি, রাজ-মহিষীদিগের আদেশেই ঈদৃশ নীচজনোচিত কার্য্য স্বীকার করিয়াছি। আমি ব্রাহ্মণের দুহিতা। রাজরাণী হইব বলিয়াই পিতা আমাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। সুভদ্রাঙ্গীর এই বাক্যে সমস্ত ঘটনা বিন্দুসারের স্মৃতিপথ-বর্ত্তী হইল। তখন বিন্দুসার আর কোন অসম্মতি প্রদর্শন করিলেন না, আদর-সহকারে সুভদ্রাঙ্গীর পাণিগ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহাকে সর্ব্বপ্রধান রাজমহিষী করিয়া অন্তঃপুরে রাখিলেন।

মহারাজ অশোক এই সুভদ্রাঙ্গীর সন্তান। তনয়ের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণে জননীর সকল শোক দূর হইয়াছিল, এই জন্য ভূমিষ্ঠ পুত্রের নাম অশোক হয়। অশোকের অঙ্গ সৌষ্ঠব মনোহারি ছিল না, এতন্নিবন্ধন বিন্দুসার তাঁহার প্রতি তাদৃশ স্নেহ প্রদর্শন করিতেন না। অধিকন্তু অশোকের স্বভাব সাতিশয় অপ্রীতি-কর ছিল, তিনি প্রায়ই দুঃশীলতার পরিচয় দিয়া অপরের বিরক্তি উৎপাদন করিতেন। এইরূপ বামচারী হওয়াতে তাঁহার অপর নাম চণ্ড হইয়াছিল। মহারাজ বিন্দুসার বিদ্যা শিক্ষার জন্য পুত্রকে পিঙ্গলবৎস নামে একজন জ্যোতির্ব্বেত্তার হস্তে সমর্পণ করেন। পিঙ্গলবৎস অশোকের নানারূপ সৌভাগ্য-চিহ্ন পরীক্ষা করিয়া কহিয়াছিলেন, এই বালক পিতৃ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবে। অশোক ব্যতীত সুভদ্রাঙ্গীর আর

একটী পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ইহার নাম বীতাশোক অথবা বিগতাশোক।

ক্রমে অশোক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার স্বভাবের কোনও পরিবর্ত্ত লক্ষিত হইল না। অশোক পূর্ব্বের ন্যায় উগ্রতা ও দুঃশীলতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। এজন্য বিন্দুসার বিরক্ত হইয়া পুত্রকে স্থানান্তরিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সময়ে পাটলীপুত্র হইতে বহুদূরবর্ত্তী তক্ষশিলায় ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, অশোক পিতৃ-নিদেশে এই বিদ্রোহ শান্তির জন্য যাত্রা করিলেন। অশোকের কৌশলে বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। অশোক তত্রত্য অধিবাসিগণ-কর্ত্তৃক সাদরে পরিগৃহীত হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এই সময় বিন্দুসারের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র সুসীম পাটলীপুত্র নগরে সাতিশয় উপদ্রব আরম্ভ করাতে প্রধান অমাত্য নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠেন। মহারাজ বিন্দুসার অমাত্যের পরামর্শে সুসীমকে তক্ষশিলায় প্রেরণ করিয়া অশোককে পুনরায় রাজধানীতে আনয়ন করেন।

মহারাজ বিন্দুসার ক্রমে ঐহিক জীবনের চরম সীমায় উপনীত হইলেন, তাঁহার মৃত্যুকাল আসন্ন হইল, যদিও তিনি অশোককে রাজ্যাধিকারী করিতে সাতিশয় অসম্মত ছিলেন, তথাপি অমাত্যের অনুরোধে তাঁহাকে তদ্বিষয়ে সম্মতি দিতে হইল। সুতরাং অবিলম্বে অশোক যথাবিধানে রাজ্যে অভিষিক্ত ও সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। এদিকে সুসীম পৈতৃক রাজ্যলাভে হতাশ হওয়াতে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া পাটলীপুত্র আক্রমণ করিলেন। অশোক তাঁহার সুদক্ষ মন্ত্রী রাধাগুপ্তের সাহায্যে সুসীমকে পরাজিত করিয়া ভাবী অনিষ্টের নিবারণ জন্য অমাত্যদিগকে অন্যান্য রাজবংশীয়দিগের প্রাণ

সংহার করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু অমাত্যগণ এই আদেশ প্রতিপালনে সম্মত হইলেন না। তখন অশোক স্বয়ংই সকলের শিরশ্ছেদ করিয়া নিষ্কণ্টক হইলেন।

একদা অশোক শুনিতে পাইলেন, অন্তঃপুরচারিণী কামিনী-গণ একটী অশোক বৃক্ষের শাখা ভগ্ন করিয়াছে। এই সংবাদে অশোকের হৃদয়ে আঘাত লাগিল; তিনি যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া চণ্ডগিরিক নামে একজন ক্রূরপ্রকৃতি দুরাত্মাকে সেই সমস্ত রমণীদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। চণ্ডগিরিক প্রভুর আজ্ঞায় একটী কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া হুতাশন প্রজ্জ্বলিত করিল, এবং একে একে অপরাধিনী কামিনীদিগকে তাহাতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এইরূপে কিয়ৎকাল মধ্যেই অসহায় অবলাদিগের কমনীয় দেহ ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়া গেল।

জীবনের প্রথমাবস্থায় অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের বিদ্বেষ্টা ছিলেন। তিনি উল্লিখিত চণ্ডগিরিককেই বৌদ্ধ ভিক্ষুকদিগের বিনাশ সাধনে নিয়োজিত করেন। এই সময়ে একটী বিস্ময়াবহ ঘট-নার সূত্রপাত হয়। সার্থবাহ নামে একজন ধনবান্ বণিক্ অপরাপর এক শত বণিকের সহিত বাণিজ্যার্থ সমুদ্র-পথে যাত্রা করেন। দ্বাদশ বৎসর পরে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিতে-ছিলেন, সহসা দস্যুগণের হস্তে নিপতিত হইয়া, অনুচরবর্গের সহিত নিহত হন। তদীয় সমস্ত সম্পত্তি এই দস্যুদিগের হস্তগত হয়। কেবল সমুদ্র নামে তাঁহার একটী মাত্র পুত্র ঘটনা-ক্রমে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। সমুদ্র হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পরিব্রাজক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হইয়া নানা স্থান পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হন। একদা তিনি যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে চণ্ডগিরি-কের গৃহে সমাগত হইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। দুরাচার

চণ্ডগিরিক বৌদ্ধ পরিব্রাজককে নিহত করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সমুদ্রের লোকাতীত কৌশলে তাহার উদ্যম কিছুতেই সফল হইল না। চণ্ডগিরিক এতন্নিবন্ধন বিস্মিত হইয়া মহারাজ অশোককে সমস্ত ঘটনা বিজ্ঞাপিত করিল, অশোক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য ঘটনা-স্থলে সমুপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার নিকট সমস্ত বিবরণ শুনিয়া চণ্ডগিরিকের শিরশ্ছেদন করিলেন।

এই অবধি বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি অশোকের আস্থা জন্মিল। অশোক বৌদ্ধভিক্ষুর অলৌকিক কার্য্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিলেন। তিনি যশ নামে একজন যতির পরামর্শে কুক্কুটোদ্যান নামক স্থানে একটী চৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বুদ্ধের অঙ্গ-বিশেষ স্থাপন করিলেন। রামগ্রাম নামক স্থানে আর একটী চৈত্য নির্ম্মিত হইল। ইহার পর অশোক তক্ষশিলার অধিবাসিদিগের প্রার্থনায় তথায় ধর্ম্মানুগত কার্য্য সম্পাদন জন্য তিন শত একান্ন কোটী স্তূপ প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। এতদ্ব্যতীত সমুদ্রতটেও এক কোটী স্তূপ প্রতিষ্ঠাপিত হইল। এই সকল ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যে অশোকের পূর্ব্বতন "চণ্ড" নাম বিলুপ্ত হইল। সাধারণে এক্ষণে তাঁহাকে ধর্ম্মাশোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে লাগিল।

অশোক উপগুপ্ত নামে একজন বৌদ্ধ যতির নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করেন। এইরূপে তিনি ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে ও ধর্ম্ম প্রচারে নিবিষ্ট-চিত্ত হইয়া উঠিলেন। পবিত্র ধর্ম্মভাব তাঁহাকে দুঃশীলতার পরিবর্ত্তে সুশীলতায়, অনুদারতার পরিবর্ত্তে উদারতায় এবং ক্রূরতার পরিবর্ত্তে সদাশয়তায় সমলঙ্কৃত করিল। তিনি এক্ষণে স্বীয় অদৃষ্টের নিকট মস্তক অবনত করিলেন, এবং উদার পদ্ধতি অনুসারে সর্ব্বত্র সমদর্শিতা ও

ন্যায়পরতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অশোক ধর্ম্মতত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, ধর্ম্মোপদেষ্টার অনুরোধক্রমে প্রধান প্রধান বৌদ্ধ তীর্থ পর্য্যবেক্ষণ মানসে দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন। লুম্বিনী উদ্যানের যে ভুরুহমূলে বুদ্ধ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, যে স্থান বুদ্ধের যৌবন কালের ক্রীড়া-ভুমি ছিল, এবং যে জম্বু-বৃক্ষ মূলে বুদ্ধ কঠোর তপস্যায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন, অশোক তৎসমুদায় পরিদর্শন পূর্ব্বক পবিত্রচিত্ত হন। শেষোক্ত স্থানে অশোকের যত্নে একটী মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এইরূপে অশোক প্রধান প্রধান পুণ্যক্ষেত্র সকল পরিদর্শন পূর্ব্বক রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রচার করিলেন যে, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম তাঁহার রাজ্যের ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং এই ধর্ম্ম সম্প্রসারিত ও গৌরবান্বিত করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত অর্থই উৎসর্গ করা যাইবে। প্রথিত আছে, অশোক পুরুষানু-ক্রমিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করাতে প্রধানা মহিষী পরিষ্যরক্ষিতা সাতিশয় বিরক্ত হইয়া মাতঙ্গী নামে একটী চণ্ডালীকে বুদ্ধ গয়ার বোধী বৃক্ষ বিনষ্ট করিতে অনুরোধ করেন। চণ্ডালপত্নী কঠোর ঔষধ প্রয়োগে পবিত্র বৃক্ষকে জীবনী শক্তি-শূন্য ও বিশুষ্ক-প্রায় করিয়া তুলে। অশোক এই সংবাদে হৃদয়ে যারপর নাই আঘাত পাইলেন। মহিষী বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে প্রফুল্ল করিতে পারিলেন না। পরিশেষে পরিষ্য-রক্ষিতার অনুজ্ঞায় চণ্ডাল-জায়া বৃক্ষটী পুনর্জ্জীবিত করিল, অশোকও পূর্ব্ববৎ হৃষ্ট ও প্রফুল্লচিত্ত হইলেন।

মহারাজ অশোক সুপিণ্ডোলভরদ্বাজ নামে একজন যতিকে তাঁহার সাম্রাজ্যের সমুদয় স্থলে ধর্ম্ম প্রচার করিতে নিযোজিত করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্ম প্রচারকগণও নানাস্থানে প্রেরিত হন। ইহাঁরা সকল স্থলেই সাধারণকে পিতা মাতার

প্রতি ভক্তি, ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদিগের প্রতি দয়া ও শ্রদ্ধা, সত্য কথা, দান, জীব-সমূহের প্রতি অহিংসা প্রভৃতি বিষয়ে আসক্ত করিতে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। অশোক প্রতি পঞ্চম বর্ষে ধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তিদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়া, ধর্ম্ম বিষয়ক বিচার শ্রবণ করিতেন। এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মহামতি অশোক এই সম্প্রদায় সমূহের একীকরণ মানসে স্বীয় রাজাব্দের অষ্টাদশ বর্ষে রাজ্য-স্থিত সমস্ত জ্ঞানী ও ধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তিদিগকে একটী মহতী সভায় আহ্বান করেন। এই সভায় বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহের শৃঙ্খলা-বিধান ও অর্থ নিরূপণের পর ধর্ম্ম প্রচারার্থ স্থানে স্থানে প্রবীণ বৌদ্ধদিগকে প্রেরণের প্রস্তাব হয়। এই প্রস্তাবানুসারে মহাধর্ম্মরক্ষিত নামে একজন প্রধান ধর্ম্মোপদেষ্টা মহারাষ্ট্রে গমন করিয়া এক লক্ষ সপ্ততি সহস্র ব্যক্তিকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ইহাদের ধর্ম্ম-শিক্ষার্থ দশ সহস্র পুরোহিত নিয়োজিত হন।

অন্যান্য ধর্ম্ম প্রচারকগণ হৈমবত প্রদেশে যাইয়া কাশ্মীর ও গান্ধার (বর্ত্তমান কান্দাহার) প্রভৃতি দেশে ধর্ম্ম প্রচার করেন। মহেন্দ্র নামে অশোকের বিংশতি বর্ষ-বয়স্ক একটী পুত্র সিংহলে প্রেরিত হইয়া তত্রত্য প্রিয়দর্শী নামক রাজাকে সপরি-বারে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এইরূপে অশোকের উৎসাহ ও যত্ন-বলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুল প্রচার হয়, এবং এইরূপে বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারকগণ হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের জয়-পতাকা উড্ডীন করেন।

মহারাজ অশোক প্রজারঞ্জন করিয়া "রাজ" শব্দ অন্বর্থ করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বীয় অনুশাসন-পত্রে আপনার বংশ-ধরদিগকে প্রজাদিগের হিতৈষী হইতে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছেন। অশোক জীবনের প্রথমাবস্থায় পাপাচরণ করিয়া-

ছিলেন বটে, কিন্তু শেষাবস্থায় তাঁহার চরিত্র পবিত্র ও ধর্ম্মানু-রক্ত হইয়াছিল। তিনি স্বীয় রাজ্যের প্রতি অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরে কূপ খনন এবং স্থানে স্থানে পশু পক্ষী প্রভৃতি জীবের রক্ষার্থ ধর্ম্মশালা স্থাপন করেন। তাঁহার হৃদয় অনুক্ষণ করুণার মোহিনী মাধুরীতে শোভিত থাকিত। তিনি কলিঙ্গ দেশ জয় করিয়া পরাজিত শত্রুদিগকে কখনও বিনষ্ট অথবা দাস করেন নাই। তাঁহার রাজ্যে ঘোরতর অপরাধীর প্রায়ই প্রাণ-দণ্ড হইত না। তিনি দোষী ব্যক্তিকে শুদ্ধাচারী ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে সংযত করিবার জন্য ধর্ম্মোপদেশকের নিকট প্রেরণ করিতেন।

অশোক কাহাকেও বল পূর্ব্বক নিজ ধর্ম্মে আনয়ন করিতেন না। তিনি কর্ম্মচারিদিগকে ভূয়োভূয়ঃ আদেশ করিয়াছেন যে, ভ্রষ্টাচারিদিগকে উপদেশ দিয়া ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম পথে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। তাঁহার রাজ্যে ব্রাহ্মণগণ পরম সুখে আপনাদের ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। অশোক ব্রাহ্মণ-দিগের কখনও নিষ্ঠুরাচরণ করেন নাই, প্রত্যুত তিনি স্বীয় ধর্ম্ম-লিপিতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, অগ্রে ব্রাহ্মণ পশ্চাৎ শ্রমণ-দিগকে দান করিতে হইবে।

শাসন-কার্য্যে অশোকের পক্ষপাত ছিল না। অশোক সমদর্শিতা-গুণে সকলকেই সমান ভাবে নিরীক্ষণ করিতেন। তিনি উপযুক্ত ব্রাহ্মণদিগকে উচ্চপদে আরোহিত করিতে কাতর হন নাই, এতদ্ব্যতীত অশোক সৎপাত্রে অনেক অর্থ দান করি-তেন। এক এক সময়ে তিনি দানশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র ও মহিষীগণ সর্ব্বদা দান করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট অর্থ পাইতেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অশোকের আদেশে অনেক স্থানে সুদৃশ্য স্তম্ভ প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। এই সকল স্তম্ভ ব্যতীত অশোক শিবি নগরের নিকটে

একটী উত্তম সেতু ও কাশ্মীরে দুটী সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। অশোক তাঁহার পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত অপেক্ষা রাজ্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। উত্তরে কাশ্মীর, পশ্চিমে গুর্জ্জর, দক্ষিণে কর্ণাট পূর্ব্বে কলিঙ্গ এবং বোধ হয় সমুদয় বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার প্রসারিত হইয়াছিল। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় প্রধান প্রধান প্রদেশেই অশোকের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়া তাঁহার মহত্ত্ব, কীর্ত্তি ও প্রতাপকে শত গুণে পরিবর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল।

মহারাজ অশোক এইরূপ পরম সুখে সপ্তাধিক ত্রিংশৎ বর্ষকাল রাজ্য ভোগ করিয়া লোকান্তরিত হন। অদ্যাপি তাঁহার ধর্ম্ম-লিপি ও অনুশাসন-পত্র সমূহে তদীয় মহত্ত্ব-চিহ্ন দেদীপ্যমান রহিয়াছে। মহারাজ ধর্ম্মাশোকের পবিত্র নাম কখনও পবিত্র ইতিহাসের হৃদয় হইতে স্খলিত হইবে না। তাঁহার মহাপ্রাণতা, তাঁহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, তাঁহার উদারতা এবং তাঁহার ধর্ম্মভাব অনন্ত কাল তাঁহাকে পরিদৃশ্যমান জগতের বরণীয় করিয়া রাখিবে।

কথিত আছে, অশোক বিক্রমাদিত্য সংবতের ২০৫ বৎসর পূর্ব্বে পাটলীপুত্রের সিংহাসনে অধিরোহণ এবং বুদ্ধের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির ২০২ বৎসর পরে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। যাহা হউক, তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর তদীয় তনয়গণ সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লন। জ্যেষ্ঠ পুত্র কুনাল পঞ্জাবের সিংহাসনে সমাসীন হন, দ্বিতীয় রাজকুমার জলোক কাশ্মীর গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের পরিবর্ত্তে শিবপূজা-পদ্ধতি প্রচার করিতে যত্নপর হইয়া উঠেন, এবং তৃতীয় রাজকুমার পাটলীপুত্রের শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন।

সম্পূর্ণ।